ইসলামি জীবন ব্যবস্থা ও মা'রেফাতের নিগূঢ় রহস্য

কাজী মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম সুখনগরী

সংকলকের আরয

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। যিনি মেহেরবাণী করে নিজের ইবাদতের জন্য মানবকুলকে সৃষ্টি করেছেন। দুরূদ ও সালাম নাযিল হোক আম্বিয়াকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। যিনি সর্বশেষ নবী-রাসূল হিসেবে প্রেরিত এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সৃষ্টিকুলের জন্য হেদায়েতের আলোক-বর্তিকা।

লক্ষ্যণীয় যে, মহান আল্লাহ্‌কে রাজি-খুশির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি ভয়-ভক্তির জন্য অন্তরাত্মার দ্বার খুলে না নিয়ে শুধু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিলাওয়াতে কোরআন সূরা-আয়াত, রুকু-সেজদাতে তসবীহ্-তাশাহুদ, দোয়া-দরূদ পাঠেই যিকির নামাজ আদায় করলে— উহা নিজের জন্য নাম জাহেরী ও লোক দেখানো অমনোযোগী ধোঁকাবাজি ইবাদত ত হলোই বটে, কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি প্রেমের জন্য উহা কোন ইবাদতই নয়। এমন ইবাদতকারী মহান আল্লাহ্‌র অভিশাপে ও পরকালে কঠিন লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই দুনিয়া ও নিজেকে ভুলে যেয়ে মহান আল্লাহ্‌র নিকট শুদ্ধ ও কবুলের যোগ্য প্রত্যেক ইবাদত-নামাজ, যিকিরে গভীর মনোযোগে অন্তরাত্মায় ধ্যানে-সাধনায়, আধ্যাত্মিকতায় কিভাবে ইবাদত-যিকির করতে হবে এ লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ বইটি লিখিত হলো।

শিক্ষকতা ও ইমামতির দায়িত্ব পালনে ও ইসলামী যিন্দিগীর নিমিত্তে নিজে জেনে অপরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তাই ইসলামী জীবন সম্পর্কে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করে নিজের জন্য সদকায়ে জারিয়ার আমল চালু করে যাবার একান্ত ইচ্ছা হলো। যার ফলশ্রুতিতেই প্রথম এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ। কিতাবটি পাঠ করে মুসলমান ভাই-বোনেরা উভয় জাহানে উপকৃত হলেই স্বার্থক হবে আমার এই প্রচেষ্টা।

লেখা-লেখির জগতে আমার যোগ্যতার অভাব ও মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং সুহৃদ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আরয হলো বিশেষ কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

অবশেষে মহান প্রভূর দরবারে আকুতি হলো— তিনি যেন এই কিতাবের পাঠক মণ্ডলী, সংকলক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আপন ক্ষমার আঁচলে ঢেকে নেন। আল্লাহুম্মা আমিন।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা

দ্বিতীয় অধ্যায়

মারেফাতের নিগূঢ় রহস্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

বিস্‌মিল্লাহ্‌র ফজিলত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্‌মিল্লা-হির্‌ রাহ্‌ মা-নির্‌ রা'হী-ম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময়, দয়াবান আল্লাহ্‌ পাকের নামে শুরু করলাম।

১. দুনিয়াতে যখন বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফ সর্বপ্রথম নাজিল হয়, তখন পাহাড়-পর্বত সমূহ থর-থর করে কেঁপে উঠে। সে সময় আল্লাহ্‌ পাকের প্রিয় বান্দাগণ বলেছেন যে, যারা এই নাম পড়বে তারা দোজখে যাবে না।

২. বিস্‌মিল্লাহ্‌ শরীফ সর্বাগ্রে হরত আদম (আ.)-এর উপর নাজিল হয় এবং ইহার অসীম বরকত ও রহমতে আল্লাহ্‌ পাক তাঁর গোনাহ্‌ মা'ফ করে দেন।

৩. দ্বিতীয় বার হযরত নূহ (আ.)-এর উপর নাজিল হয়। তিনি নৌকায় বসে উহা পড়তে থাকেন ও বিপদ হতে রক্ষা পান।

৪. তৃতীয়বার হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর উপর নাজিল হয়। তিনি নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত অবস্থায় উহা পড়তে থাকেন, তৎফলে ভীষণ তেজ:দ্বীপ্ত অগ্নিশিখা ফুল বাগিচায় পরিণত হয়ে তিনি রক্ষা পান।

৫. অতঃপর, মহানবী (সা.)-এর উপর নাজিল হয়েছিল। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকবে। ইহার অফুরন্ত রহমত ও বরকতে তাঁর উম্মৎগণ সারা বিশ্বে জয়যুক্ত ও সুফলতা লাভ করবেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌!

(মোজার রাবাতে দায়রবী)

ইসলাম ধর্মের পরিচয়

ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। আল্লাহ সর্বশক্তিমান। সে ক্ষমতাবান সত্তার নিরঙ্কুর সার্বভৌমত্বের উপর অদৃশ্যভাবে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান। আর সে ঈমান বা বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন গঠনকেই বলা হয় ইসলাম। যে কোন যুগের যে কোন লোকই সৎপথে চলতে চায় সেই ইসলাম নামক শান্তির পতাকার নীচে আশ্রয় নিতে পারে। আর যারা ইসলামের শান্তির নীড়ে বাস করে তারাই হচ্ছে মুসলমান।

ইসলামের ভিত্তি

ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা ঃ ১. কালিমা পাঠ করা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাক্ষ্য দেয়া। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. হজ্ব পালন করা। ৫. রমযানুল মোবারকের রোযা পালন করা।

কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

এ কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ হল মুসলমান রূপে পরিচয়ের প্রধান শর্ত।

কালিমায়ে শাহাদাৎ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক তথা অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

কালিমায়ে তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা ওয়াহিদাল লা-ছানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাক্বীনা রাসূলু রাব্বিল আ'লামীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। তুমি একক; তোমার কোন দ্বিতীয় নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিনি মুত্তাক্বীগণের ইমাম এবং বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পুরুষ।

কালিমায়ে তামজীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা নূরাই ইয়াহ্দিয়াল্লাহ্ লিনূরিহী মাইঁয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালীনা ওয়া খাতামুন নাবীয়্যীন।

অর্থ ঃ হে প্রভু! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য বা আরাধনার পাত্র নেই। তুমি একটি নূর। যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়াত দান কর। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, যিনি রাসূলগণের ইমাম এবং নবীগণের সর্বশেষ নবী।

ঈমানে মুজ্মাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَاۤئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লা-হি কামা-হুওয়া বিআসমা-ইহী ওয়াছিফা-তিহী ওয়াক্বাবিলতু জামী'আ আহ্কামিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন! তাঁর সমস্ত নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনলাম এবং তাঁর যাবতীয় হুকুম-আহ্কাম গ্রহণ করলাম।

ঈমানে মুফাস্সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল্ ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শার্রিহী মিনাল্লাহি তা'আলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাওত।

অর্থ ঃ আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্ তা'আলার উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, শেষ দিবসের উপর তাকদীরের ভাল-মন্দ হওয়া একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি।

পবিত্রতার বিবরণ

পবিত্রতা মোমিন জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইহা ঈমানের একটি অঙ্গ। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ۔

উচ্চারণ ঃ আত তুহরু শাতরুল ঈমান।

অর্থ ঃ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বিশেষ প্রকাশ থাকে যে, প্রতিটি নেক কাজের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য।

অপবিত্রতার প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, নাজাসাত বা অপবিত্রতা দুই প্রকার। যথা ঃ

১. নাজাসাতে গলীজা ২. নাজাসাতে খফীফা।

১. নাজাসাতে গলীজা বা মারাত্মক নাপাকী ঃ এ ধরনের নাপাকী বড় ধরনের। যে সকল বস্তুর নাপাকী মারাত্মক ধরনের উহা নাজাসাতে গলীজার পর্যায়ভুক্ত। যেমন– প্রবাহমান রক্ত, মেয়েলোকের হায়েজ-নেফাসের রক্ত, মানুষের মলমূত্র, বীর্য, কুকুর ও বিড়ালের মল-মূত্র, হাস-মুরগীর পায়খানা প্রভৃতিকে বড় ধরনের নাপাকী বলা হয়।

২. নাজাসাতে খফীফা বা কম মারাত্মক নাপাকী ঃ নাজাসাতে গলীজা ছাড়া আর যত রকম নাপাক বস্তু রয়েছে, সব নাজাসাতে খফীফা। গরু, ভেড়া, মহিষ ইত্যাদি যে সকল পশুর গোশত খাওয়া হালাল, তাদের মূত্র, ঘোড়ার মূত্র এবং যে সকল পাখীর মাংস খাওয়া হারাম তাদের পায়খানা নাজাসাতে খফীফা। এ ধরনের নাজাসাত শরীর অথবা জামা-কাপড়ে লাগলে যে অংশে লেগেছে, সে অংশের চার ভাগের একভাগ হতে কম হলে মাফ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ . وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থ : পরম করুণাময়, দয়াবান আল্লাহ্ পাকের নামে আরম্ভ করলাম। যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্র জন্য, তিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। উত্তম আন্‌জাম ঐ সব লোকদের জন্য, যাঁরা পরহেজগার এবং মহান আল্লাহ্র রহমত নবীগণের শেষ হযরত মোহম্মদ (সা.)-এর উপর ও সকল নবী এবং রাসূল (সা.)গণের উপর বর্ষিত হোক।

অজুর নিয়মসমূহ

অজুর পূর্বে ভালভাবে মিস্ওয়াক করে এবং বিস্‌মিল্লাহ্ ও দোয়া পড়ে অজু আরম্ভ করা। কিবলামুখী হয়ে উঁচু জায়গায় বসা। ডান হতে অজু শুরু করা। সমস্ত অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া, দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলা।

পায়খানা-পেশাব সেরে মুক্ত হয়ে অজু করা। অজুতে কারো সাহায্য না নেয়া, পানি কম ব্যবহার করা। অজুর পানি ছিটিয়ে অন্যের শরীরে যেন না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, অজুর পানি সরাসরি ময়লার ড্রেনে না ফেলা, অজুর পরে অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা। অজুর শেষে দুই রাক্‌য়াত তাহিয়্যাতুল অজু নফল নামাজ পড়ার অভ্যাস করা, অজুর পরে আকাশের দিকে তাকিয়ে কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করা।

অযু করতে বসে পড়বার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ . وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ.

বাংলা উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম, ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি আ'লা দ্বীনিল ইসলাম। আল্‌ইসলামু হাক্কুন ওয়াল কুফ্‌রু বাতিলুন। আল্ ইসলামু নূরুন ওয়াল্ কুফ্‌রু জুল্‌মাতুন।"

অর্থ ঃ "সর্ব মহান আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম। ইসলাম ধর্মের জন্য সম্যক প্রশংসাই আল্লাহর উপযুক্ত। কেননা, ইসলাম সত্য ও কুফরী মিথ্যা এবং ইসলাম আলোকময়, কুফরী অন্ধকারময়।"

তিনবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোবার সময় অজুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى.

উচ্চারণ ঃ "নাওয়াইতুয়ান আতাওয়ায্‌যায়া লিরাফয়িল হাদাছি, ওয়াছতিবাহাতাল্ লিচ্ছালাতি ওয়া তাকার্‌রুবান ইলাল্লাহি তা'আলা।"

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার রেজামন্দী হাছিলের উদ্দেশ্যে এবং পবিত্রাবস্থায় নামাজ পড়বার জন্য অপবিত্রতা দূর করার জন্য অজু করতেছি।

তিনবার কুলি কর্‌বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى تِلَاوَتِ الْقُرْاٰنِ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা আ'য়েন্নি আ'লা তিলাওয়াতিল কুরআনে আ'লা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা।"

অর্থ ঃ "ওহে আল্লাহ্ পাক, আমাকে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে এবং আপনাকে স্মরণ-শুকরিয়া ও সুন্দরতম ইবাদত করবার সাহায্য করুন।

তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرِحْنِىْ رَائِحَةَ النَّارِ.

"আল্লাহুম্মা আরেহ্‌নি রায়েহাতাল্ জান্নাতি, ওয়ালাতুরিহ্‌নি রায়েহাতান নার।"

অর্থ ঃ ওহে আল্লাহ্‌পাক! আমাকে (এই নাকে) বেহেশ্‌তের সুবাস দান করুন। কিন্তু দোযখের দুর্গন্ধ দিবেন না।

তিনবার মুখ ধোবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.

আল্লাহুম্মা বাইয়্যিজ্ ওয়াজ্‌হি ইয়াওমা তাব্‌ইয়াদ্দু ওজুহুন্ ওয়া তাস্‌ওয়াদ্দু ওজুহুন্।

অর্থ ঃ ওহে আল্লাহ্ পাক! কারো মুখ (পরকালে) যখন কালো বর্ণ হবে তখন আমার মুখখানা সাদা বর্ণে আলোকিত করে দিবেন।

ডান হাতের কইনুয়ের উপর পর্যন্ত তিনবার ধোবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

"আল্লাহুম্মা আ'তিনি কিতাবী বি-ইয়ামীনি, ওয়া হাসিবনি হিসাবাঈ ইয়াসিরা।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্ পাক! আমার (এই) ডাইন হাতে নেকীর আ'মল নামা দান করুন এবং পরকালের সকল প্রকার হিসাব সহজ করে দিন।"

বাম হাতের কনূইয়ের উপর পর্যন্ত তিনবার ধোবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ.

"আল্লাহুম্মা লা-তু'তিনি কিতাবী বিশিমালী।"

অর্থ : "হে আল্লাহ্ পাক! আপনি আমাকে বাম হাতে আ'মল নামা দিবেন না।"

মাথা মাসেহ করবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ.

"আল্লাহুম্মা আযিল্লানী তাহ্‌তা জিল্লি আর্‌শিকা ইওমা লা জিল্লা ইল্লা জিল্লু আর্‌শিকা।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্ পাক! যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আরশের ছায়া তলে আমার ছায়া করে দিবেন।"

ডান পা টাক্‌নূর উপর পর্যন্ত তিনবার ধোবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلَى الصِّرَاطِ.

"আল্লাহুম্মা ছাব্বিত কাদামী আলাছ্ ছিরাত।"

অর্থ ঃ ওহে আল্লাহ্ পাক! পুল্‌ছিরাতের উপর আমার পা দু'খানা স্থির রেখে দিবেন।"

বাম পা টাখনুর উপর পর্যন্ত তিনবার ধোবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِيْ مَغْفُوْرًا وَّسَاعِيْ مَشْكُوْرًا وَّتِجَارَتِيْ لَنْ تَبُوْرًا.

"আল্লাহুম্মাগ্‌ফির যাম্বি মাগ্‌ফুরাওঁ ওয়া সায়ী মাশ্‌কুরাওঁ ওয়া তিজারাতি লান্ তাবুরা।"

অর্থ : "ওহে মহান আল্লাহ্! আমার গুণাহগুলো ক্ষমা করেদিন ও শুক্‌রিয়া আদায় করবার শক্তি দিয়ে দিন এবং আমার ব্যবসাগুলো বরবাদ করে দিবেন না।"

অজুর শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে কালেমা শাহাদাত পড়তে হয়

হাদিস শরীফে আছে– "যে ব্যক্তি অজু কর্‌বার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিম্নে এই তাশাহ্‌হুদটি পড়বেন, আল্লাহ পাক, ঐ পাঠকারীর জন্য বেহেশতের আট্‌টি দরজা খুলে দিবেন। তিনি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে দরজা দিয়েই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবেন।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"আশ্‌হাদু আন্‌ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাহুম্মাজ্‌ আল্‌নী মিনাত্তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌ আল্‌নী মিনাল্‌ মুতা তাহ্‌হেরীন।"

অর্থ : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল। ওহে মহান আল্লাহ্‌! আমাকে তোমার তওবাকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও এবং পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিও।

অজুর ফজিলত

রাসূল করিম (সা.) বলেছেন ঃ ওহে আবু হুরায়রা (রা.) তুমি যখন অজু করে অবসর হবে, অতঃপর সূরা কদর ইন্না আন্‌জাল্‌না পড়বে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এরূপ আ'মল করবে, তার এরূপ প্রত্যেক পবিত্রতার জন্য এমন এক বৎসরের ইবাদতের মত ইবাদত হিসেবে আল্লাহ্‌ পাক গণ্য করবেন যে, সারা বৎসরের দিনে রোজা রাখছেন এবং সারা বৎসরের রাত্রি জাগিয়ে নফল নামাজ পড়ছেন। (ওছিয়তুন্‌ নবী-লুবাবুল আখ্‌বার)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল করিম (সা.) বলেছেন : বান্দা মুসলমান বা মু'মিন- যখন অজু করে মুখ ধোবার শেষ ফোঁটা পানি ঝরে পড়ার সাথে সাথেই তার সমস্ত ছোট গুণা মাফ হয়ে যায়, যা সে মুখ ও চোখ" দ্বারা করেছে। ঐ রূপ "হাত ধোবার" শেষ ফোটা পানি পড়ার সাথে-সাথেই তার সমস্ত ছোট গুণাহ্‌ মাফ হয়, যা সে হাত দ্বারা করেছে। এবং "পা" ধোবার শেষ ফোটা পানি ঝরে পড়তে পড়তেই তার সমস্ত ছোট গুণাহ্‌ মাফ হয়ে যায়, যা সে চলার পথে "পায়ের" দ্বারা করেছে। এমনকি, অজু শেষে সে সমস্ত গুণা হতেই পাক ছাফ হয়ে যায়। (এতে বুঝা গেল অজু শেষ হবার পরে তার ছোট কোনই গুনাহ আর থাকে না) মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-১২৫। অজুর ফজিলত সম্পর্কে এরূপ আরো বহু হাদিস বর্ণিত আছে। এ ছোট বইটিতে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

মস্‌জিদে প্রবেশের নিয়মাবলী

মস্‌জিদে প্রবেশের সময় "ডান পা" ও বাহির হবার সময় "বাম পা" রাখতে হয়। অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখা, সম্ভব হলে দু'রাক্‌'আত নফল নামাজ পড়া। দুনিয়াবী কথাবার্তা লেনদেন না করা, প্রথম কাতারে দাঁড়াতে চেষ্টা

করা, জোরে কথা না বলা। যিকির তিলাওয়াত ও নামাজে সময় ব্যয় করা। উঁচু স্বরে না হাসা, সব সময় মস্‌জিদ পবিত্র রাখা।

মস্‌জিদ দেখা মাত্র দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَخَطَائِىْ وَعَمْدِىْ.

"আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী যুনুবী ওয়া খাতায়ী ওয়া আ'মাদী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্‌ পাক! আপনি আমার ভুল-ভ্রান্তি ও ইচ্ছাকৃত গুনাসমূহ মাফ করে দিন।

মস্‌জিদে প্রবেশের দোয়া

মস্‌জিদে প্রবেশ করবার সময় প্রথমে "ডান পা" ভিতরে দিয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ اَلسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"বিস্‌মিল্লাহি আচ্ছালাতু আস্‌সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ্‌। আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী যুনুবী ওয়াফ্‌ তাহ্‌লী আব্‌ওয়া রাহ্‌মাতিকা।"

অর্থ : আল্লাহ্‌ তা'আলার নামে শুরু করেতেছি। রাসূলুল্লাহ্‌র উপরে ছালাত ও সালাম। ওহে আল্লাহ্‌! আমার গুনাহ্‌ সমূহ্‌ মাফ করে দিন। আপনার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দিন।

মস্‌জিদ হতে বের হবার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"বিস্‌মিল্লাহি আচ্ছালাতু ওয়া আস্‌-সালাসু আ'লা রাসূলিল্লাহ্‌। আল্লাহুম্মা ইন্নি আছ্‌আলুকা মিন্‌ ফাদ্‌লিকা।"

অর্থ : "আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করতেছি। রাসূলুল্লাহের উপরে সালাত ও সালাম। হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার অনুগ্রহ চাচ্ছি।"

পায়খানা-প্রস্রাবের নিয়মসমূহ

পায়খানা-প্রশ্রাবের স্থানে বাম পা রেখে প্রবেশ করা, ডান পা দিয়ে বাইর হওয়া, জুতা-স্যান্ডেল পায়ে রাখা, মাথা ও শরীর ঢেকে রাখা। কিব্‌লার দিকে

মুখ ও পিঠ দিয়ে না বসা। গাছ, যাতায়াতের রাস্তায়, গর্তে, অজু গোসলের স্থানে, বাতাসের দিকে, নিচু থেকে উঁচু স্থানের দিকে প্রস্রাব-পায়খানা, না-করা।

হাড্ডি, কয়লা, লিখনের কাগজ, গাছের পাতা দিয়ে ঢিলা কুলুক না করা। হ্যাঁ-টিসু-টয়লেট পেপার চলবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করা, প্রবেশ ও বাহির হবার সময় দোয়া পড়া। প্রশ্রাব ও পায়খানার সময় কোন কথা না বলা। উপরের দিকে, শরম গাহের দিকে না তাকানো। সতর খুলে না বসা, হাটু ঢেকে রাখা।

প্রস্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের দোয়া

প্রশ্রাব ও পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআটি পড়বে, অতঃপর বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুব্‌ছি ওয়াল খাবাইছ।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্ পাক! আমি নাপাক, পিচাশ ও পিচাশী শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে মুক্তি চাচ্ছি।"

প্রস্রাব পায়খানা হতে বের হবার দোয়া

প্রশ্রাব ও পায়খানাগার হতে বাহির হবার সময় ডান পা আগে বাহির করবে, বের হয়ে এই দোয়া পড়তে হয়।

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَعَفَانِیْ.

"গুফ্‌রানাকা আল-হাম্‌দু লিল্লাহিল্ লাজী আয্‌হাবা আন্নিল আযা ওয়া আ'ফানী।"

অর্থ : "হে আল্লাহ্ পাক! আমি আপনার নিকট গুনাহ্ মা'ফের আশা করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি আমার নাপাকী জিনিসকে দূর করে আরাম দান করেছেন।

আয়নায় মুখ দেখার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِیْ فَحَسِّنْ خُلُقِیْ.

"আল্লাহুম্মা আন্‌তা হাস্‌সান্‌তা খাল্‌কী ফাহাস্‌সিন খুলুকী।"

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ পাক! আপনি যেভাবে আমার চেহারাকে সুন্দর করেছেন, তদ্রুপ আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন।"

পোশাক পরার নিয়ম

না-পাক পোশাক না-পরা, সুন্নতী পোশাক পরা, লুঙ্গী মাথার উপর হতে, পায়জামা বসে, পাগ্‌ড়ী দাঁড়িয়ে পরা। লাল বর্ণের ও খুব পাত্‌লা কাপড় না পরা; প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় না পড়া। বিজাতির পোশাক পরিধান করা মোটেই ঠিক নয়।

যে কোন পোশাক পরার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ.

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উয়ারী বিহী আওরাতী ও আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতি।"

অর্থ : "যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ পাকের, যিনি আমাকে কাপড় পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমার লজ্জা ঢেকেছি এবং জীবনের সৌন্দর্য লাভ করেছি।"

নতুন চাঁদ দেখার দোয়া

নতুন চাঁদ দেখে নিম্ন দোয়া পড়লে সে ঐ চন্দ্র মাস ভরে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।"

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

"আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আ'লাইনা বিল্ আমনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ।"

অর্থ : "হে আল্লাহ পাক! এই নতুন চাঁদকে আমাদের প্রতি ঈমান ও নিরাপত্তা এবং শান্তির সহিত উদয় করুন। হে চাঁদ, আল্লাহ্ পাকই আমার এবং তোমার প্রতিপালক।"

রোগী ও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখে যে দোয়া পড়তে হয়

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

"আস আলুল্লাহাল্ আ'জীমা রাব্বাল আ'রশিল্ আযীম। আন-ইয়াশ্‌ফিয়াকা।

অর্থ : "আমি প্রার্থনা করি মহান আল্লাহ্‌র নিকট, যিনি সম্মানিত আরশের প্রতিপালক। তিনি যেন তোমাকে সুস্থ করে দেন।"

বিপদে পড়লে পড়বার দোয়া

নিজে যখন রোগী বা কোন বিপদে পড়লে নিচের দোয়াটি পড়তে হয়। ইন্‌শাআল্লাহ দেরিতে হলেও এতে মুক্তি পাওয়া যাবে। হযরত আইয়ুব (আ.) এ দোয়া পড়ার ফলে কঠিন রোগ হতে মুক্তি পেয়েছিলেন। (কুরআন)

رَبِّ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ.

রাব্বি আন্নী মাস্‌সানিয়াদুররু ওয়া আন্তা আরহামুর্‌ রা-হিমীন।

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি বিপদগ্রস্ত, আর আপনিই সবচেয়ে বেশী দয়াবান। (অতএব, নিজ দয়ায় আমার কষ্ট দূর করে দিন।)"

নৌকা স্টিমারে উঠে পড়বার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ.

"বিস্‌মিল্লাহি মাজ্‌রেহা ওয়া মুর্‌সাহা ইন্না রাব্বী লাগাফুরুর্‌রাহীম।"

অর্থ : "মহান আল্লাহর নামেই ইহার গতি ও অবস্থান, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

গাড়ী ও বিমানে উঠে পড়বার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

"আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহি সোব্‌হানাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হাযা ওমা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বীনা লামুন্‌ক্বালিবুন।"

অর্থ : "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য, যিনি পবিত্র, যিনি এই যান্‌বাহন ও ছাওয়ারীকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অন্যথায়, আমরা ইহাকে কখনও অনুগত বানাতে সমর্থ ছিলাম না। আর আমরা আমাদের প্রভুর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

কোন শহরে প্রবেশ করে পড়বার দোয়া

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

"রাব্বী আন্‌-জিল্‌নী মুন্‌জালাম মুবারাকাওঁ ওয়া আন্তা খাইরুল্‌ মুন্‌যিলিন।"

অর্থ : "হে প্রভু! আপনি আমাকে মঙ্গলময় স্থানে অবতীর্ণ করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ অবতীর্ণকারী।"

কোন বাজারে প্রবেশকালে পড়বার দোয়া

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে এই দোয়া পড়বে, আল্লাহ পাক তার আ'মল নামায় ১০ লক্ষ নেকী লিখে দিবেন। ও আ'মলনামা হতে ১০ লক্ষ গুনাহ্ মুছে দিবেন এবং তার মর্যাদা ১০ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দিবেন। তার জন্য বেহেশতে একটি সুন্দর ঘর নির্মাণ করে দিবেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

"লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যূল লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির।

অর্থ : "মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। সমস্ত বিশ্ব তাঁরই এবং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। তিনি আমাদেরকে জীবিত করেন ও মৃত্যুদান করেন। আর তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরবেন না। যাবতীয় কল্যাণ তাঁরই অধিকারে এবং তিনি সকল বিষয়েই সর্বশক্তিমান।"

খাবার নিয়মসমূহ

দস্তরখানা বিছিয়ে খাওয়া, বিস্‌মিল্লাহ্ ও দোয়া পড়ে খাবার শুরু করা। মাথা ঢেকে রাখা, আলোতে খাওয়া, লবণ দ্বারা খাবার শুরু করা, দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়ে খাওয়া, সামনে ডান পাশ হতে শুরু করা, খাবার চিবানোর সময় মনে মনে, সোব্‌হানাল্লাহ্ আর গিল্‌বার সময় আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ বলা। তিন অবস্থার এক অবস্থায় বসে খাওয়া। ১. নামাজের অবস্থায়। ২. দুই হাটু উঠিয়ে বসা। ৩. এক হাটু উঠিয়ে ও এক হাটু নামিয়ে বসা। পেটের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য খাওয়া, এক ভাগ পানি ও এক ভাগ আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য খালি রাখা। খাদ্য ঢেকে রাখা ও পানি তিন ঢোকে পান করা, শ্বাস পানির মধ্যে না ফেলা। খাবার সময় সালাম ও কথা না বলা। আঙ্গুল ও থালা পরিষ্কার করে চেটে খাওয়া, দস্তরখানায় খাদ্য পড়লে উহা তুলে খাওয়া। খাদ্য ফুঁকে-ফুঁকে না খাওয়া।

খাবার আগে পড়বার দোয়া

নিজের উপার্জিত খাদ্য হলে খাবার আগে নিম্নে দোয়া পড়ে খেলে খাদ্যে খুব বরকত হয়।

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ.

"বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ্।"

অর্থ : "আমি আল্লাহ্ পাকের নামে এবং আল্লাহ পাকের বরকতের উপর শুরু করতেছি।

যদি নিজের উপার্জিত খাদ্য হয় খাবার শেষে পড়বার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

"আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌য়ামানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল্ মুস্‌লিমীন।"

অর্থ : "যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করালেন, পান করালেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"

দাওয়াত খাবার পর পড়বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَنْ اَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ.

"আল্লাহুম্মা আত্বয়িম্ মান্ আত্ব-আ'মানী ওয়াস্‌কী মান সাকানী।"

অর্থ : ওহে আল্লাহ পাক! যিনি আমাকে খাওয়ালেন তাকেও আপনি খাওয়ান এবং যিনি পান করালেন তাকেও পান করান।

দুধ, চা ও শরবত পান করলে পড়বার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ.

"আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি-হী ওয়া যিদ্‌না মিন্‌হু"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ পাক! এতে আমাদের জন্য বরকত দান করুন এবং আরো বেশী করে দান করুন।"

যে কোন ফল খাবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا.

"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী ছামারিনা, ওয়া বারিকলানা ফী মাদিনাতিনা- ওয়া বারিক লানা-ফী মুদ্দিনা।

অর্থ : ওহে আল্লাহ্ পাক! এই ফলগুলোতে, শহর-বাজারে, ও ওজনে, বেশী বেশী করে বরকত বাড়িয়ে দিন।

বিছানায় শোয়ার নিয়ম

অজু করে বিছানায় শোয়া, বিছানা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নেয়া। রুমের দরজা-গেট বন্ধ করে নেয়া। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য ওঠার অভ্যাস করা। শোয়ার পর চোখ বন্ধ করে সারা দিনের নেক ও বদ কামের হিসেব করা। নেক কাজ হলে শুক্‌রিয়া আদায় করা ও বদ কাজ হলে তওবা করা বা মাফ চাওয়া।

ডান কাতে হাঁটু কিছু বাঁকা করে ডান হাত মাথার নিচে দিয়ে শোয়ার অভ্যাস করা। সামান্য হলেও মৃত্যু ও কবরের কথা খেয়াল করা। কিব্‌লার দিকে পা দিয়ে না শোয়া।

* চারবার সূরায়ে ফাতিহা পড়ে শুইলে চার হাজার দিনার (আরবের টাকা হিসেবে) দানের সমান নেকী মিলবে। তিনবার সূরা এখলাছ (কুল হুয়াল্লাহ) পড়লে এক খতম কুরআন শরীফ পড়ার সমান নেকী পাওয়া যাবে।

* তিনবার দূরূদ শরীফ পড়ে শুইলে বেহেশতের মূল্য আদায় করার নেকী মিল্‌বে।

* সোব্‌হানাল্লাহ্ ওয়াল হাম্‌দুলিল্লাহ্ ওয়া লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ আক্‌বার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আজীম। একবার পড়ে শুইলে একটা কবুলের যোগ্য হজের নেকী পাওয়া যাবে।

শোয়ার আগে পড়বার দোয়া

১. নিম্ন দোয়া দু'টি পাঠ করে শুইলে সারা রাত্রি বিপদ মুক্ত হয়ে থাকা যায়। اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ উচ্চারণ : "আল্লাহুম্মা বিছ্‌মিকা আমুতু ওয়া আহ্‌ইয়া।" অর্থ : "ওহে আল্লাহ পাক! আপনার নামের সহিত মৃত্যুবরণ করি ও জীবিত হই।'

২. যে ব্যক্তি নিম্নের দোয়াটি পাঠ করে শুইবে, আল্লাহ না করুন, যদি ঘুমের মধ্যেই মারা যায় তবে ইহার বরকতে শহীদি মর্যাদা পাবে। (বুখারী শরীফ)

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ. وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ. وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ

. وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ. رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ. لَامَلْجَاَ وَلَامَنْجَاَ مِنْكَ اِلَّا

اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ. وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ.

"আল্লাহুম্মা আস্‌লামতু নাফ্‌সী ইলাইকা। ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হি ইলাইকা। ওয়া ফাওয়াদ্‌তু আম্‌রী ইলাইকা। ওয়া আলজা'তু যাহ্‌রী ইলাইকা। রাগাবাতাওঁ ওয়া রাহ্‌বাতান ইলাইকা। লা মাল্‌জা' ওয়ালা মান্‌জা মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা। আমান্‌তু বিকিতাবিকাল্‌লাজী আন্‌যালতা। ওয়া নাবিয়্যিকাল্‌ লাজী আর্‌সালতা।

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্‌ পাক! আমার জীবনকে আপনার নিকট অর্পণ করলাম। ও সর্বস্ব আপনার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আপনার নে'মতের প্রতি আশা ও আপনার শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে আপনারই উপর ভরসা করলাম। আপনার শাস্তি হতে মুক্তি পাবার আশ্রয়স্থল আপনি ব্যতীত আর কেহ নেই। হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার প্রেরিত কিতাব ও নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

নিদ্রা হতে জেগে উঠে পড়বার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

"আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহিল্‌ লাজী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশুর।"

অর্থ : "যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু অবস্থা হতে জীবিত অবস্থায় আনয়ন করেছেন। অর্থাৎ- নিদ্রাহতে জাগ্রত করেছেন। পরিশেষে, তাঁরই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে।

ঈমান ঠিক্‌ রাখার দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ.

"আল্লাহুম্মা ইয়া মুকাল্লিবাল্‌ ক্বুলুবি সাব্বিত ক্বাল্‌বী আ'লা দ্বীনিকা।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্‌ পাক! আপনিই অন্তর পরিচালক, আমার অন্তরকে আপনার দ্বিনের উপর কায়েম রাখুন।"

স্ত্রী সহবাস কালে পড়বার দোয়া

নিম্নের দোয়া না পড়ে স্ত্রী সহবাস করলে শয়তান শরীক হয়। তাতে সন্তান হলে শয়তানের স্বভাব হতে পারে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

"বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌না ওয়া জান্নিবিশ শাইতান-মা-রাজাক্তানা।"

অর্থ : "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করতেছি। ওহে আল্লাহ মহান! আমাকে বিতাড়িত শয়তান (কুমন্ত্রণা) হতে বাঁচান এবং আমার জন্য যা হালাল করেছেন তা হতে শয়তানকে দূর করুন।"

রুজী বৃদ্ধির জন্য পড়বার দোয়া

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ.

"আল্লাহ্ লাত্বীফুন্ বিইবাদিহি ইয়ারযুকু মাই-ইয়াশা'উ' ওয়া হুয়াল কাভীউল আ'জীজ।"

অর্থ : "আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু, যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি শক্তিশালী ও মহা ক্ষমতাবান।"

হাঁচি আস্‌লে যে দোয়া পড়তে হয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

"আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি হাম্‌দান্ কাছিরান্ ত্বৈয়্যিবান মুবারাকান ফী-হি।"

অর্থ : সমুদয় গুণ-প্রশংসা এবং পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

হাঁচি দাতা পুরুষ হলে যে শুন্‌বে সে পড়বে

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ "ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ্।"

অর্থ : "আল্লাহ্ পাক, তোমাকে রহম করুন।"

হাঁচি মেয়ে লোকের হলে পড়বে যে শুনবে

يَرْحَمُكِ اللّٰهُ "ইয়ার্‌হামু কিল্লাহ্।"

অর্থ : "আল্লাহ পাক! তোমাকে (স্ত্রী) রহম করুন।"

হাই আস্‌লে পড়তে হয়

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আ'লীয়্যিল আজীম।"

অর্থ : "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের শক্তি ব্যতীত আর কারো কোন শক্তি সামর্থ্য নেই।"

ফল কাট্‌তে পড়বার দোয়া

ফল কাট্‌বার সময় এই দোয়া পড়ে কাট্‌লে উক্ত ফল সুমিষ্ট হবে।

فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : "অত:পর তারা (বনি ইস্রাঈলগণ হযরত মুছা (আ.) এর পরামর্শ অনুযায়ী) উহা (গাভী) জবেহ্ করলো এবং গাভীর আকৃতি-প্রকৃতি লয়ে তাদের বিতর্কের প্রেক্ষিতে তারা ইহা করতে প্রস্তুত ছিল না।"

দোযখ হতে মুক্তি পাবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.

"আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নার।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ্ পাক! আমাদেরকে দোজখের আগুন হতে বাঁচিয়ে রাখুন।"

কিয়ামতের দিনে হিসাব সহজের দোয়া

اَللّٰهُمَّ حَسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا.

"আল্লাহুম্মা হাসিব্নী হিসাবাই ইয়াসীরা।"

অর্থ : "ওহে মহান আল্লাহ! আমার হিসাব সহজ করুন।"

মাতা-পিতার জন্য রহমতের দোয়া

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا.

"রাব্বির হাম্ হুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগিরা।"

অর্থ : "ওহে আল্লাহ মহান! আমার পিতা-মাতার উপর ঐরূপ দয়া করুন, যেরূপ তারা আমাদেরকে ছোটবেলায় (দয়া ও মমতার সহিত) লালন-পালন করেছেন।"

ছেলে-মেয়ে পরিবার দ্বীনদার হবার দোয়া

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.

"রাব্বানা হাব্লানা মিন্ আয্ ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রি ইয়্যাতিনা ক্কুর্‌রাতা আ'ইউনিউ উয়াজ্ আল্‌না লিল্ মুত্তাক্কীনা ইমামা।"

অর্থ : "হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের চক্ষুর শীতলতার উপকরণ, আমাদের চক্ষুর শান্তির উপকরণ বানিয়ে দিন এবং আমাদেরকে পরহেজগার মুত্তাকী লোকদের ইমাম বানিয়ে দিন।

অজুর মধ্যে ফরজ কাজ সমূহ

অজুর মধ্যে ফরজ কাজ চারিটি যথা : ১. মুখমণ্ডল ধৌত করা ২. উভয় হাতের কনুইয়ের উপর পর্যন্ত ধৌত করা ৩. মাথার কম পক্ষে চারি ভাগের এক ভাগ মাসেহ্ করা ৪. উভয় পা গিরার উপর পর্যন্ত ধৌত করা।

অজুর সুন্নত কাজ সমূহ

অজুর মধ্যে সুন্নত কাজ ১৪টি। যথা : ১. মিস্ওয়াক করা ২. বিস্মিল্লাহ্ পাঠ করা ৩. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা ৪. কুলি কর্বার সময় গড়্গড়া করা ৫. নাকের ভিতরে পানি পৌছানো ৬. দাঁড়ি খেলাল করা ৭. প্রত্যেক অঙ্গ তিন্বার ধৌত করা ৮. পায়ের আঙ্গুল সমূহ্ খেলাল করা ৯. সমস্ত মাথা মাসেহ করা ১০. দুই কান মাসেহ্ করা ১১. অজুর প্রথমে নিয়ত করা ১২. অজুর ধারা শৃঙ্খলার সহিত পালন করা ১৩. একবার পানি ঢেলে উক্ত পানি শুকাবার পূর্বে আবার পানি ঢালা ১৪. এস্তেঞ্জার পরে অপবিত্র স্থান পানির সাহায্যে ধৌত করা।

অজুর মোস্তহাব কাজ সমূহ

অজুর মধ্যে মোস্তহাব কাজ পনেরটি। যথা : ১. ডানদিক হতে অজু শুরু করা ২. ঘাড় মাসেহ্ করা ৩. কিবলামুখী হয়ে হয়ে অজু করা ৪. নামাজের ওয়াক্ত হবার পূর্বেই অজু করা ৫. অজুতে অন্যের সাহায না লওয়া ৫. অজু করবার সময় কথা না বলা ৭. প্রত্যেক অঙ্গ উত্তম রূপে মর্দন করা ৮. উঁচু স্থানে বসে অজু করা ৯. অজুর নিয়ত মুখে ও মনে-মনে বলা ১০. আংটি ও গয়না নেড়ে লওয়া ১১. প্রত্যেক অঙ্গ ধোবার সময় বিস্মিল্লাহ্ ও দরূদ পাঠ করা ১২. উভয় কান মাসেহ্ করা ও কানের কুহরে ছোট আঙ্গুল প্রবেশ করানো ১৩. অতিরিক্ত পানি খরচ না করা ১৪. অজু শেষে দরূদ ও কালেমা শাহাদত পাঠ করা ১৫. অজুর শেষে অবশিষ্ট পানি হতে কিছু পানি পান করা।

যেসব কারণে অজু ভঙ্গ হয়

নিম্নের বারটি কারণে অজু ভঙ্গ হয়। যথা : ১. মলমূত্র ত্যাগ করলে ২. বাহ্যদ্বারে রায়ু নির্গত হলে ৩. বীর্যপাত হলে ৪. বাহ্যদ্বারে রক্ত বা বীর্যাদি বাহির হলে ৫. শরীরে কোন স্থান হতে রক্ত বা পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে ৬. কোন কিছুর সহিত হেলান দিয়ে নিদ্রা গেলে ৭. নিদ্রায় অচেতন হলে ৮. মুখ ভরে বমি হলে ৯. নেশার দ্রব্য ব্যবহারে মাতাল হলে ১০. উম্মাদ বা পাগল হলে ১১. নামাজের মধ্যে শব্দ করে হাস্লে ১২. স্ত্রী পুরুষের গোপন অঙ্গ একত্রিত হলে।

গোসলের বিবরণ

আভিধানিক অর্থে গোসল হল– স্নান করা, ধৌত করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মাথা হতে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর পবিত্রতা লাভের জন্য উত্তম রূপে পানি দ্বারা ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসলের ফরযসমূহ

গোসলের ফরয তিনটি। যথা ঃ ১. গড়াগড়াসহ কুলি করা। ২. নাকে পানি দেয়া। ৩. সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে এমনভাবে ধৌত করা যাতে একটি পশমের গোড়াও শুকনো না থাকে। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত গোসল ফরয ও ওয়াজিব গোসলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যান্য গোসলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না।

গোসলের সুন্নাতসমূহ

গোসলের সুন্নাত ৮টি। যথা ঃ ১. নিয়ত করা। ২. তিনবার গড়গড়াসহ কুলি করা। ৩. দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। ৪. তিনবার নাকে পানি দেয়া। ৫. পা ধৌত করা ছাড়া নামাযের ওযূর মত ওযূ করে নেয়া। ৬. শরীরের যে জায়গায় নাপাকী লেগে রয়েছে তা ধৌত করে ফেলা। ৭. লজ্জাস্থান ভালভাবে ধৌত করা। ৮. সমস্ত শরীর তিনবার ভাল করে ধৌত করা। উপরোক্ত পন্থায় গোসল করলে, গোসল ওযূ উভয়টাই হয়ে যাবে। পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন হবে না।

গোসলের নিয়ত

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গোসলা লিরাফই'ল জানাবাতি।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করার লক্ষ্যে গোসলের নিয়ত করছি।

তায়াম্মুমের বিবরণ

তায়াম্মুম ইসলামি শরিয়তে একটি সহজতর বিধান। কোন মুসলমান পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযু গোসল করতে অক্ষম হলে তার জন্য তায়াম্মুমের বিধান রয়েছে। তায়াম্মুম শব্দের আভিধানিক অর্থ হল নিয়ত করা বা সংকল্প করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করা। অর্থাৎ, ওযূ কিংবা গোসলের প্রয়োজনে পানির অভাবে অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহারে অসমর্থ হলে

পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পবিত্র বস্তু যেমন ঃ পাথর, বালু ও মাটি জাতীয় বিভিন্ন জিনিস দ্বারা শরীর পবিত্র করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। নিম্নে তায়াম্মুম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হলো।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। যথা ঃ ১. নিয়ত করা। ২. ওযূর ভিতরে যে পরিমাণ মুখমণ্ডল ধৌত করা হয়, তায়াম্মুমেও ততটুকু স্থানই মাসেহ করা। ইহার কম স্থান মাসেহ্ করলে তায়াম্মুম দুরস্ত হবে না। ৩. উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা। সামান্য স্থানও যদি মাসেহ হতে বাদ পড়ে যায়, তবে তায়াম্মুম বৈধ নয়।

যে যে অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ

এ কথা সর্বজন বিধিত যে, ইসলাম একটি শান্তিপূর্ণ ধর্ম। মানবতার জন্য এতে রয়েছে অনুপম শিক্ষা। মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান রয়েছে এ ধর্মে। ইসলামে সকল বিষয়ের এমন সমাধান দেয়া রয়েছে যাতে কোন লোকের সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই। তায়াম্মুমেও যে ধরনের একটি সমস্যার সমাধান যার বিধান স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর বান্দার জন্য চালু করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضٰى اَوْعَلٰى سَفَرٍ اَوْجَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآئِطِ اَوْلٰمَسْتُمُ
النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا۔

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা অসুস্থ্ হও অথবা সফরের মধ্যে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ পায়খানা প্রস্রাবের কাজ সেরে আসে, অথবা স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয় অতঃপর তারা পানি না পায়, তবে তারা যেন পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুমের কাজ সমাধা করে। (সূরা-নিসা)

উল্লিখিত আয়াতের নিরিখে আলেমগণ যে সমস্ত কারণে তায়াম্মুম বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন নিম্নে তা দেয়া হল।

১. পানি বিদ্যমান তবে তা ব্যবহার করতে গেলে শত্রুর হামলার আশঙ্কা থাকলে। ২. ভয়ানক কোন হিংস্র জন্তু পানির নিকটে থাকায় পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে। ৩. কোথাও পানি পাওয়া না গেলে। ৪. পানি ব্যবহারে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ। ৫. কাছাকাছি কোথাও পানি রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা ওযূ-গোসল করলে রোগাক্রান্ত হওয়া বা ঐ পানি

ব্যবহারে রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে। ৬. পানি দ্বারা ওযূ করতে গেলে খাওয়ার পানি সংকট দেখা দিলে। ৭. যদি পানি ক্রয় করতে হয়, কিন্তু ক্রয় মূল্য সঙ্গে নেই। ৮. মুসাফির অবস্থায় পানির খোঁজ না পেলে। ৯. কূপ হতে পানি উঠানোর ব্যবস্থা না থাকলে।

তায়াম্মুমের সুন্নাতসমূহ

তায়াম্মুমের ৭টি সুন্নাত। ১. বিস্‌মিল্লাহ্ দ্বারা তায়াম্মুম শুরু করা। ২. মাটিতে রাখা অবস্থায় আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক রাখা। ৩. উভয় হাতের তালু মাটিতে রেখে সম্মুখ ও পেছনে একটু টানা। ৪. মাটি হতে হাত উঠানোর পর উভয় হাত ঝেড়ে ফেলা। ৫. দুই অঙ্গ মাসেহ্ করার মধ্যখানে বিলম্ব না করা। ৬. প্রথমে মুখমণ্ডল ও পরে হাত মাসেহ্ করা। ৭. তারতীব বজায় রাখা।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

নিয়ত করার পর উভয় হাত মাটি জাতীয় বা অন্য কোন বস্তুতে মেরে হাত দু'টি একটু ঝেড়ে ফেলে তা দ্বারা সমস্ত মাথা মাসেহ্ করতে হবে। পুনরায় পূর্বের মত হাত মেরে উভয় হাত ভালভাবে মাসেহ করতে হবে। তায়াম্মুমের তিনটি ফরয কাজ আদায় করলেই তায়াম্মুম কাজ সমাধা হয়ে যাবে।

তায়াম্মুমের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফই'ল হাদাছি ওয়াল জানাবাতি ওয়াছতিবাহাতান লিছ্ছালাতি ওয়া তাক্বাররুবান ইলাল্লাহি তাআ'লা।

অর্থ ঃ আমি তায়াম্মুমের নিয়ত করছি এ জন্য যে, যেন ছোট-বড় সকল ধরনের নাপাকী দূর করে বিশুদ্ধ নামায আদায় করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করি।

যেসব কারণে তায়াম্মুম নষ্ট হয়

১. যে সকল বিষয় দ্বারা ওযূ নষ্ট হয়ে যায় সে সকল কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। ২. মাটিতে দু'বার হাত না মারলে। ৩. তায়াম্মুমের নির্ধারিত স্থানসমূহের কোন স্থানে মাসেহ্ বাদ পড়লে। ৪. পানি পাওয়া গেলে এবং

পানি ব্যবহারের সামর্থ্য অর্জন করলে অর্থাৎ, রোগী রোগমুক্ত হলে। ৫. পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম না করলে। ৬. নিয়ত না করলে।

আযানের বিবরণ

আভিধানিক অর্থে আযান অর্থ আহ্বান করা। ইসলামি পরিভাষায় পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও জুমু'আর নামাযের পূর্বে ওয়াক্ত হলে আযান দেওয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ্।

বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে, আযান দেয়া ওয়াজিব এবং দুররুল মোখতার কিতাবে বলা হয়েছে, আযান দেয়া সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ কিন্তু না দিলে ওয়াজিব তরকের গুনাহ হবে। জামা'য়াতের জন্য যে কোন একজন আযান দিলেই সকলের পক্ষে আদায় হয়ে যাবে। নামাযের ওয়াক্ত হলে নামায পড়ার জন্য যে বাক্যগুলোর দ্বারা মুসলমানদেরকে ডাকা হয় তাকে আযান বলা হয়।

আযানের শর্ত

আযানের শর্ত হলো, দুই বাক্যের মাঝখানে একটু সময় থেমে আযানের শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন করে বলবে। আযানের কোন হরফ বাড়াবেও না আবার কমাবেও না। আওয়াজ সুমিষ্ট করে বলবে। গানের মত করে অথবা স্বরকে অস্বাভাবিকভাবে উঁচু নিচু করে অক্ষরগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে কিংবা বেশি টেনে শব্দকে রদবদল করে দেবে না। তায়াম্মুম করে আযান দেয়া জায়েয।

আযানের জওয়াব

আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ যারা আযানের বাক্যগুলো শুনবে তাদের জবাব দেয়া ওয়াজিব। মুয়াযযিন আযানে যে সমস্ত বাক্য বলবে, শ্রোতারাও তাই বলবে। কিন্তু তিনটি স্থানে পরিবর্তন হবে। যথা মুয়াযযিন 'হাইয়্যা 'আলাচ্ছালাহ্' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার সময় শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত একই কালাম দু'বার বলবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল আজীম।

অর্থ ঃ সুমহান আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় ছাড়া আমার কোন উপায় এবং শক্তি নেই।

ফজরের আযানে মুয়াযযিন যখন 'আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম' দু'বার বলবে তখন শ্রোতাগণ নিম্নলিখিত বাক্য দু'বার বলবে।

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

উচ্চারণ ঃ ছাদাকতা ওয়া বাররতা

অর্থ ঃ তুমি সত্য বলেছ ও সৎ কাজ করেছ।

আযানের উত্তর কখন ওয়াজিব নয়

১. পায়খানা ও প্রস্রাব করার সময়। ২. হায়েজ-নেফাসের সময়। ৩. সহবাস কালে। ৪. খুৎবা পাঠকালীন। ৫. নামায পড়া অবস্থায়। ৬. এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার সময়। ৭. খানা-পিনার সময়। ৮. যদি কেউ শহরের একাধিক মসজিদে আযান শুনে, তাহলে নিজ এলাকার মসজিদের আযানের জবাব দিবে।

আযানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহি দ্দাওয়াতি ত্তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্‌ফাদ্বীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিইয়াতা ওয়াব্‌আসহু মাক্বামাম্মাহ্‌মূদানিল্লাযী ওয়াআত্তাহূ ইন্নাকা লা তুখলিফুল্ মীআ'দ।

নামাজের ফযিলত

নামাজ ইসলামের পঞ্চবেনার দ্বিতীয় বেনা। এর স্থান ঈমানের পরেই। সমস্ত এবাদতের মধ্যে নামায শ্রেষ্ঠ এবাদত। নামায সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নাচ্ছালাতা তান্‌হা আনিল ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুনকার।

অর্থ ঃ নামাজ মানুষকে পঙ্কিলতা ও খারাপ কার্যাদি হতে ফিরিয়ে রাখে।

হাদীস ঃ اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু মিরাজুল মু'মিনীন।

অর্থ ঃ নামাজ মুমিনের জন্য মি'রাজ।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরো বলেছেন, নামাযই মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী। অন্যত্র তিনি বলেন– প্রতিটি জিনিসের চিহ্ন আছে, ঈমানের চিহ্ন নামায। তিনি আরো বলেন, নামায বেহেস্তের চাবি।

আল্লাহ পাক বলেন, اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

উচ্চারণ ঃ আক্বীমুচ্ছালাতা ওয়া আতুয্ যাকাতা।

অর্থ ঃ তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। আল্লাহ তায়ালা এই হুকুম কুরআনে বিরাশি স্থানে ঘোষণা করেছেন। নামাযের গুরুত্ব এর দ্বারা অনুমেয় হয়। নামায এক ওয়াক্ত স্বইচ্ছায় ত্যাগ করলে ছয় হাজার চারশত বছর দোজখের আগুনে জ্বলতে হবে। অতএব কোন মুসলমান নামায ত্যাগ করবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, জামাতের সাথে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায়।

নামায আদায়ের পদ্ধতি

ওযূ করে পবিত্র অবস্থায় পবিত্র স্থানে নামাযের মুসল্লায় বা জায়নামাযে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে।

জায়নামাযের দোয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাছ্ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা-আনা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থ ঃ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃজন করেছেন, আমি সকল দিক হতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র তাঁর দিকে মনোনিবেশ করলাম। আর আমি মুশরিকদের দলভুক্ত নই।

উপরোক্ত জায়নামাযের দোয়া পাঠের পর নামাযের নিয়ত করবে। নিয়ত করার পর দুই হাত উত্তোলন করে তাকবীর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে নামাযের নিয়ত বাধতে হবে।

প্রতিটি মুসলমান নারী-পুরুষের জন্য ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া অবশ্য কর্তব্য। নফল ও সুন্নাত নামায দাঁড়িয়ে পড়লে পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়। দাঁড়াবার সময় দু'পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রাখবে। কম বেশি হলে কোন অসুবিধা নেই এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতে হবে। জায়নামাযে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। নামাযের নিয়ত করে "আল্লাহু আকবার" বলে দু'হাত কর্ণ-মূল পর্যন্ত তুলে নাভীর উপর বাম হাতের কব্জা ডান হাত দিয়ে ধরে তাহরীমা বাঁধবে। মেয়েরা ওড়নার নীচে দুই কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে সিনার উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখবে। চুপে চুপে সানা, 'আউ'যুবিল্লাহ ও বিস্‌মিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা পড়ে আমিন বলবে। (জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণ শুধু সানা পড়ে ধ্যানের সাথে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।) পরে কমপক্ষে যে কোন বড় দু'আয়াত বা ছোট তিন আয়াত বা কোন সূরা পড়ে "আল্লাহু আকবার" বলে রুকু করবে।

নামায আরম্ভ করার তাক্‌বীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার। **অর্থ ঃ** আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাকবীর পাঠ সমাপ্ত হলে নামাযের নিয়ত বাঁধার পর নিম্নোক্ত ছানা চুপে চুপে পড়বে।

ছানা

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! প্রশংসা সহকারে তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করছি; তোমার নাম বরকতময় ও তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ; আর তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই।

ছানা পাঠ সমাপ্ত হলে তাআউজ বা আউ'যুবিল্লাহ্ পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাআউজ পাঠের পর তাসমিয়া পড়বে।

তাসমিয়াহ্ বা বিসমিল্লাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(উল্লেখ্য, নামাযে তাআউয এবং তাসমিয়া উভয়ই চুপে চুপে পাঠ করবে।)

তাআউজ ও তাছমিয়া পাঠের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, সূরা ফাতিহা পাঠ সমাপ্ত হলে অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবে, এরপর রুকূতে যাবে।

রুকু'র তাস্বীহ্

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'জীম।

অর্থ ঃ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

রুকু' হতে দাঁড়াবার তাস্বীহ্

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

উচ্চারণ ঃ সামিআ'ল্লাহু লিমান হামিদাহ।

অর্থ ঃ যে কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রশংসা করে, তা তিনি শোনেন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ার তাহ্মীদ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা লাকাল হামদ্।

অর্থ ঃ আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

এরপর তাকবীর বলে সিজদায় চলে যাবে। সিজদার সময় দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে। সিজদায় দু'হাত তালুসহ মাঝখানে চার আঙ্গুল ফাঁক রেখে তন্মধ্যে নাক ও কপাল স্থাপন করবে। মাটিতে হাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী এবং করদ্বয় ঠিক কান বরাবর থাকবে। পুরুষদের হস্তদ্বয় মাটিতে বিছানো থাকবে না। সিজদার জায়গা শক্ত হতে হবে। নারীরা সিজদায় হস্তদ্বয় মাটিতে বিছিয়ে দেবে এবং উরু ও পেট মিশিয়ে রাখবে, যাতে পর্দার খেলাফ না হয়। সিজদার তাসবীহ ৩, ৫ বা ৭ বার বলবে। তারপর তাকবীর বলে সিজদাহ

থেকে ধারাবাহিকভাবে কপাল, নাক, হাত, উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে এবং ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো পেছনে খাড়া করে বসবে। মেয়েরা সর্বাবস্থায় ডান দিকে দু'পা বের করে দিয়ে বসবে পরে তাকবীর বলে ২য় সিজদায় যাবে। সবকিছু ১ম সিজদার মত আদায় করে তাকবীর বলে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।

সিজদার তাসবীহ

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی

উচ্চারণ ঃ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

প্রকাশ থাকে যে, ২য় রাকা'তে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা বা কুরআনের আয়াতাংশ পাঠের পর ১ম রাকাতের ন্যায় রুকু সিজদাহ আদায় করে পূর্ব বর্ণিত পন্থায় বসে দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখবে। এ সময় আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে। দুই রাকাতবিশিষ্ট নামায হলে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর দুরূদ ও দোয়ায়ে মাসূরাহ পাঠ করে সালাম ফিরায়ে নামায সমাপ্ত করতে হয়।

আর চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামায হলে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য তাকবীর বলে দাঁড়াবে। আর চার রাকাতবিশিষ্ট সুন্নাত বা নফল নামায হলে আত্তাহিয়্যাতু পাঠের পর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য তাকবীর বলে দাঁড়াতে হয়।

উল্লেখ্য যে, চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হয় না।

আত্তাহিয়্যাতু

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ۔

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ্ছালিহীনা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান, সমস্ত শারীরিক ও আর্থিক এবাদাত আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহ্‌র সালাম, রহমত ও বরকত। আমার উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাহ্‌গণের প্রতি আল্লাহ্‌র শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও রাসূল।

আত্তাহিয়্যাতু পাঠের পর নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়।

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওলাদগণের উপর আপনার খাছ রহমত বর্ষণ করুন। যেমন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর আওলাদগণের উপর আপনার খাছ রহমত বর্ষণ করেছেন, নিশ্চয়ই আপনি চিরপ্রশংসিত এবং সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আওলাদগণের উপর আপনার খাছ কল্যাণ ও পূর্ণ নেয়ামত বর্ষণ করুন! যেমন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আওলাদগণের উপর আপনার খাছ কল্যাণ বর্ষণ করেছেন, নিশ্চয়ই আপনি চিরপ্রশংসিত এবং উচ্চ সম্মানের অধিকারী।

দুরূদ শরীফ পাঠ সমাপ্ত হলে নিম্নোক্ত দোয়ায়ে মাসূরাহ্ পড়বে।

দোয়ায়ে মাসূরাহ্

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাছীরাওঁ ওয়ালা-ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অনেক অত্যাচার করেছি। আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউই নেই। অতএব আপনার দয়ায় আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার উপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

দোয়ায়ে মাসূরাহ পাঠ সমাপ্ত হলে সালাম ফিরায়ে নামায সমাপ্ত করতে হয়।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

উচ্চারণ ঃ আস্ সালামু 'আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তায়ী'নুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইরা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা-নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ' ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস্আ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিলকুফ্ফারি মুলহিক্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করছি, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, আপনারই উপর ভরসা করছি, আপনারই উত্তম প্রশংসা করছি, আর (চিরকাল) আপনার শোকর গুযারী করব, (কখনো) আপনার নাশোকরী বা কুফরী করব না; যারা

আপনার নাফরমানী করে তাদের সাথে আমরা কোন সংশ্রব রাখব না। তাদের আমরা পরিত্যাগ করে চলব। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই এবাদত করব, আপনারই জন্য নামায পড়ব, আপনাকেই সিজদাহ্ করব। একমাত্র আপনারই আদেশ পালন ও আনুগত্যের জন্য সর্বদা (দৃঢ় মনে) প্রস্তুত আছি। (সর্বদা) আপনার রহমতের আশা এবং আপনার আযাবের ভয় হৃদয়ে পোষণ করি। নিশ্চয়ই আপনার আযাব কাফেরদের উপর প্রযোজ্য। (নূরুল ঈযাহ্)

নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের বাইরের ফরয ঃ ১. শরীর পাক। ২. কাপড় পাক। ৩. নামাযের জায়গা পাক। ৪. সতর ঢাকা। ৫. কেবলামুখী হওয়া। ৬. ওয়াক্ত মত নামায পড়া। ৭. নিয়ত করা।

নামাযের ভিতরের ফরয ঃ ১. তাক্‌বীরে তাহরীমা (আল্লাহ্ আকবার) বলা। ২. দাঁড়িয়ে নামায পড়া। ৩. ক্বিরাত পড়া। ৪. রুকু করা। ৫. সিজদাহ করা। ৬. শেষ বৈঠকে বসা।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি যথা ঃ ১. প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহা পড়া। ২. সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোন সূরা বা (কমপক্ষে তিন বা বড় এক আয়াত) আয়াত মিলানো। ৩. রুকু-সিজদার মাঝে দেরি করা। ৪. রুকু থেকে সোজা হয়ে খাড়া হওয়া। ৫. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা। ৬. ১ম বৈঠক দু'রাকাত পূরণ করে বসা। ৭. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া। ৮. ইমামের জন্য কিরাআত জোরের জায়গায় জোরে পড়া (ফজর, মাগরিব, এশা, জুম্মার ফরয নামায ও দুই ঈদের নামায) এবং আস্তের জায়গায় (যোহর, আসর) আস্তে পড়া। ৯. বিতরের নামাযে দোয়ায়ে কুনুত পড়া। ১০. দুই ঈদের নামাযে ছয় তাকবীর পড়। ১১. প্রত্যেক রাকাআতের ফরযগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ১২. প্রত্যেক রাকাআতের ওয়াজিবগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। ১৪. সালাম বলে নামায সমাপ্ত করা।

নামাযের সুন্নাতে মুআক্কাদাহসমূহ

নামাযের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ১২টিঃ ১. বিসমিল্লাহ্ পড়া। ২. দোয়ায়ে মাছুরা পড়া। ৩. প্রত্যেক উঠা-বসায় "আল্লাহু আকবার" বলা। ৪. ছানা পড়া। ৫. দুই হাত উঠান। ৬. দুই হাত বাঁধা। ৭. আ'উযুবিল্লাহ্ পড়া। ৮.

আলহামদুর (সূরা ফাতিহার) পর "আমিন" বলা। ৯. রুকুর তাসবীহ পড়া। ১০. রুকু থেকে উঠার সময় তাহ্মীদ ও তাসমীয়া বলা। ১১. সিজদার তাসবীহ পড়া। ১২. দুরূদ শরীফ পড়া।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়

ফজর ঃ প্রত্যুষে সুবহে সাদেক তথা পূর্ব আকাশে উত্তর দক্ষিণে বিস্তারিত সাদা আভার রেখা দৃশ্যমান হওয়া থেকে শুরু করে সূর্য উদয় না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত রূপে গণ্য হবে।

যোহর ঃ দ্বিপ্রহরের পর যখন সূর্য সামান্য মাত্র ঢলে পড়ে তখন থেকে যোহরের ওয়াক্ত হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া উহার দ্বিগুণ না হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। যোহর শুরু থেকে ৩ বা ৩.৩০ ঘন্টা সময় পর্যন্ত এর ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে।

আছর ঃ যোহরের ওয়াক্তের শেষ থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আছরের ওয়াক্ত। কিন্তু সূর্যের রঙ হলদে হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত, তারপর মাকরূহ ওয়াক্ত রূপে গণ্য হয়।

মাগরিব ঃ পশ্চিমাকাশে সূর্য সম্পূর্ণভাবে অস্তের পর থেকে পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লাল বর্ণ থাকে ততক্ষণ মাগরিবের ওয়াক্ত বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মাগরিবের নামায দেরী করে পড়া মাকরূহ বলে সকল ইমাম অভিমত পেশ করেছেন।

এশা ঃ মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর অর্থাৎ পশ্চিম আকাশে কালবর্ণ ধারণ থেকে শুরু করে সুবহে ছাদেকের পূর্ব পর্যন্ত এশার ওয়াক্ত। উল্লেখ্য, রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মোস্তাহাব ওয়াক্ত। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মোবাহ্ ওয়াক্ত এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর থেকে সুবহে ছাদেক পর্যন্ত এশার জন্য মাকরূহ ওয়াক্ত রূপে বিবেচিত।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামি শরিয়তে তিন সময় নামায পড়া নিষেধ।

১ম ঃ ভোরের সূর্য উদয় হওয়ার সময়। (২৩ মিনিট)

২য় ঃ সূর্য যখন মাথার উপর বরাবর থাকে। **৩য় ঃ** সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়।

প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি যদি আছর নামায না পড়ে থাকে তবে সূর্যাস্তের পূর্বে আছরের ফরয নামায আদায় করতে পারে যাতে নামায কাযা না হয়। এছাড়া উপরোক্ত সময় কোন প্রকার ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামায পড়া বৈধ নয়। বরং হারাম।

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ নামাযের মাঝে ঘটলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়।

(১) কুরআন শরীফ দেখে পড়লে, (২) আমলে কাসীর (যে কাজ দেখে মানুষ ধারণা করতে পারে যে, সে ব্যক্তি নামাযে নেই) করলে, (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিলে। (৪) নামাযে ইচ্ছা করে অথবা ভুলবশতঃ কথা বললে, (৫) সিজ্‌দার সময় দু পা মাটি থেকে তুলে ফেললে, (৬) শুভ সংবাদে আল হামদুলিল্লাহ্ বললে, (৭) মন্দ সংবাদে 'ইন্না লিল্লাহ' বললে, (৮) নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দিলে, (৯) পানাহার করলে, (১০) কোন ব্যাথা-বেদনায় আহ্ উহ্ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করলে, (১১) বিনা ওজরে গলা খাকরালে, (১২) সালাম দিলে, (১৩) সালামের উত্তর দিলে, (১৪) মানুষের কথা বলে কোন দোয়া করলে, (১৫) ওযূ বা গোসলের কোন কারণ উপস্থিত হলে, (১৬) উন্মাদ ও অচৈতন্য হয়ে পড়লে, (১৭) কোন রোকন (ফরয শর্ত) ছেড়ে দিলে, (১৮) কিবলার দিক থেকে মুখ ও সিনা সরে গেলে, (১৯) জামাতের সময় ইমামের আগে দাঁড়ালে, (২০) নাপাক বস্তুর উপর সিজ্‌দা করলে, (২১) দু'হাত দিয়ে কোন কাজ সমাধা করলে, (২২) কোন কাজ ইমামের আগে করে পুনরায় ইমামের সাথে শরীক না হলে, (২৩) কোন রোকন নিদ্রিত অবস্থায় আদায় করলে, (২৪) আল্লাহু আকবার বলার সময় আল্লাহ শব্দের ১ম আ-কে লম্বা করলে বা 'আকবার শব্দের' 'বা' কে অধিক দীর্ঘ করে পড়লে।

সাহ্ সিজদাহ্

সাহ্ শব্দের অর্থ ভুল। সাহ্ সিজদা হল, নামাযে কোনো ভুল হওয়ার পর নামাযকে শুদ্ধ করার এক শরীয়ত সম্মত সুন্দর পন্থা। নামায পড়ার সময় ভুলবশতঃ কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটো সিজদা দেয়া ওয়াজিব। একেই 'সিজদায়ে সাহ্ বলে। এই সিজদার পর নিয়ম মত শুরু থেকে আত্তাহিয়্যাতু, দুরুদ, দোয়া'য়ে মাসুরাহ্ পড়ে সালাম ফিরানোর পর নামায শেষ করবে।

কখন সাহ্ সিজদাহ দিতে হবে

(১) ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে, (২) মুক্তাদির নিজের ভুলের জন্য সাহ্ সিজদা করবে না, (৩) ওয়াজিব ছুটে গেলে, (৪) জোরের জায়গায় আস্তে বা আস্তের জায়গায় জোরে ক্বিরাত পড়লে, (৫) ওয়াজিবের তরতীব

ভুল হলে, (৬) ভুলক্রমে ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে সূরা মিলাতে বাদ পড়লে, (৭) ১ম বৈঠকে তাশাহহুদের পর আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ পর্যন্ত পড়লে বা এই পরিমাণ সময় চুপ করে বসে থাকলে, (৮) প্রথম বা শেষ বৈঠকে ভুল ক্রমে তাশাহহুদ না পড়লে, (৯) ভুলে দুই রুকু বা তিন সিজদা করলে, (১০) প্রথম বৈঠকে ভুলে গিয়ে উঠে দাঁড়ানোর কাছাকাছি যদি পৌছে যায় তা হলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শেষে সোহ সিজদাহ করতে হবে। (১১) মাসবুকের বাকী নামাযে ভুল হলে তাকে শেষ বৈঠকে সেজদা ভুল আদায় করতে হবে।

জানাযার নামায

প্রকাশ থাকে যে, জানাযার নামায হল এক প্রকার দোয়া। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার আগে মৃতকে সামনে রেখে চার তাকবীরসহ যে নামায আদায় করা হয়, তাকে জানাযার নামায বলে। ইহা "ফরজে কেফায়া"। ইহা এক দুইজনে আদায় করলেও সকলের আদায় হয়; কিন্তু কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। সুতরাং আমাদেরকে এ নামাযের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

জানাযার নামায পড়ার পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে একটি খাটের উপর উত্তর শিয়রী করে শোয়াবে। মৃত ব্যক্তি যদি মহিলা হয় তবে বিশেষ ভাল পর্দার ব্যবস্থা করবে। ইমাম সাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে ঠিক তার বুক বরাবর দাঁড়াবেন। এরপর নিয়ত করে উচ্চস্বরে তাকবীর বলে যথা নিয়মে তাহরীমা বাঁধবে। মুক্তাদিগণও বিনা আওয়াজে চুপে চুপে নিয়ত ও তাকবীর বলে ইমাম সাহেবের অনুকরণ করবে। তারপর সকলে নীরবে দুরূদ পড়বে, যা নামাযে আমরা পড়ে থাকি। অতঃপর ইমাম সাহেব ৩য় তাকবীর বলবে, মোক্তাদিরা তার অনুসরণ করবে ও আস্তে আস্তে দোয়ায়ে মাছুরা (আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়িনা থেকে আলাল ঈমান পর্যন্ত পড়বে) অতঃপর ঈমাম সাহেব ৪র্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবেন। মুক্তাদিগণ তার অনুসরণ করে সালাম ফিরায়ে নামায শেষ করবে। অতঃপর মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবে।

জানাযার নিয়ত

সর্বপ্রথমে জানাযার নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত নিয়ত পাঠ করবে।

نَوَيْتُ اَنْ اُوَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔

বাংলা নিয়ত ঃ জানাযার ফরজে কেফায়া নামায কেবলামূখী হয়ে চার তাকবীরের সাথে এই ইমামের পেছনে আদায় করতেছি- আল্লাহু আকবার।

বিঃ দ্রঃ আর যদি মুর্দার মহিলা হয় তবে لِهٰذَا الْمَيِّتِ এর স্থলে لِهٰذِهِ الْمَيِّتِ পড়তে হবে।

সানা পাঠ

নিয়ত পাঠ শেষ করার পর ১ম তাকবীর "আল্লাহু আকবার" বলার পর নিম্নের সানা পড়বে। উল্লেখ্য, নিয়তের শেষে যে তাকবীর রয়েছে তাই জানাযার নামাযের প্রথম তাকবীর বলে বিবেচিত।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ۔

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমরা তোমারই পবিত্রতার গুণগান করছি, তুমি মঙ্গল বিধানকারী, তোমার গৌরব উজ্জল তোমার প্রশংসা শ্রেষ্ঠ, তুমি ব্যতীত আর কেউই উপাস্য বা আরাধনার পাত্র নেই।'

দ্বিতীয় তাকবীর ঃ উল্লিখিত ছানা পাঠের পর দ্বিতীয় তাকবীর আদায় করবে। তারপর দুরূদ শরীফ পড়বে যা নামাযে তাশাহহুদের পর পড়া হয়ে থাকে।

দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ۔

তৃতীয় তাকবীর ঃ দুরূদ পড়ে তৃতীয় তাকবীর বলবে। প্রথম তাকবীর ব্যতীত বাকী তিন তাকবীরে কান পর্যন্ত হাত উঠানো যাবে না।

দোয়ায়ে মাছুরাহ্ (জানাযার দোয়া)

[মৃতব্যক্তি বালেগ হলে ৩য় তাকবীরের পর নিম্নের দোয়া পড়বে]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ۔

আর মৃত যদি নাবালেগ ছেলে হয়, তাহলে উপরোক্ত দোয়ার পরিবর্তে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا۔

আর মৃত যদি নাবালেগ মেয়ে হয়, তাহলে নিম্নের দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারত্বাও ওয়াজআলহা লানা আজরাও ওয়া যুখরাও ওয়াজআলহা লানা শফিআতাও ওয়া মুশাফফাআহ্।

চতুর্থ তাকবীর ঃ ৪র্থ তাকবীর হল জানাযা নামায সমাপ্ত করার তাকবীর। ৪র্থ তাকবীর বলার পর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

[**বিঃ দ্রঃ** জানাযার নামাযের নিয়ম হল প্রথম তাকবীরে হাত কান পর্যন্ত তুলবে, পরের তাকবীরগুলোতে হাত বাঁধা অবস্থায় থাকবে। সালামের পরে হাত ছেড়ে দিতে হয়।]

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ

الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ نَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا اللهُ وَاِيَّاكُمْ اٰمِيْنَ۔

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালামু আ'লাইকুম ইয়া আহ্লাল্ কুবূরি মিনাল্ মুস্‌লিমীনা ওয়াল মু'মিনীনা আনতুম লানা সালাফুওঁ ওয়া নাহনু লাকুম তাবাউওঁ ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ্ বিকুম লা-হিকুনা ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতা'খীরিনা নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুম ওয়া ইয়ারহামুনাল্লা-হু ওয়া ইয়্যাকুম, আমীন।

রোযা ও তারাবীহের নামায

রোযা শব্দের আভিধানিক অর্থ জ্বালিয়ে দেয়া। কারণ, রোযা মানুষের গুনাহসমূহকে জ্বালিয়ে দিয়ে বান্দাকে মুত্তাকী করে গড়ে তোলে, তাই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। রোযা ইসলামের তৃতীয় রোকন। প্রত্যেক সাবালক নারী পুরুষের উপর রোযা ফরয। এছাড়া রমযানের রোযা বা উহার কাযা ফরয। কাফ্ফারার রোযা ও মান্নতের রোযা ওয়াজিব। আশুরার দিনের রোযা সুন্নাত, প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোযা, জুমুআর দিনের, ৯ই জিলহজ্বের এবং শাওয়ালের ৬টি রোযা মুস্তাহাব তথা অত্যন্ত ভাল।

প্রকাশ থাকে যে, বছরে যে ৫ দিন রোযা রাখা হারাম ঃ ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আযহার দিন এবং উহার সংলগ্ন পরের তিন দিন।

রোযার নিয়ত করার নিয়ম ঃ রমযানের রোযা, নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা, নফল রোযা ইত্যাদিতে সকাল থেকে দুপুরের আগে নিয়ত করবে। রমযানের কাযা, অনির্দিষ্ট মান্নত ও কাফ্ফারা রোযার নিয়ত ফজরের আগে করতে হবে। রমযানের রোযা ফরয। অন্তরে নিয়ত করতে হবে অর্থাৎ "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখব।" মুখে বলা মুস্তাহাব বা উত্তম।

রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন শাহরি রামাদ্বানাল মুবারাকি ফারদ্বাললাকা ইয়াআল্লাহু ফাতাক্বাব্বাল মিন্নি ইন্নাকা আনতাস্ সামিউল আলীম। **বাংলায় নিয়ত ঃ** "আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আগামী কাল রোযা রাখব।"

ইফতারের দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া'আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি, এবং তোমার দেওয়া রিযিক দিয়ে রোযা খুলছি।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

(১) ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার, স্বামী-স্ত্রী সঙ্গম, ঔষধ ও তামাকাদি পান করলে, এতে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, (২) সারা রমযানে রোযার নিয়ত না করলে (৩) গলায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করলে (৪) স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করায় লজ্জাস্থান থেকে পানি বের হলে, (৫) অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুলির পানি ভেতরে গেলে। (৬) স্বেচ্ছায় মুখ ভর্তি বমি করলে। (৭) অখাদ্য জাতীয় ঘৃণিত বস্তু গিলে ফেললে। (৮) ভুলে আহার করতঃ রোযা ভেঙ্গে গেছে ধারণায় পুনরায় পেট পুরে খেলে (৯) জবরদস্তি করে কেউ কিছু খাওয়ালে, (১০) নাক-কানে এমনভাবে ঔষধ দেয়া যাতে উহা পেটে বা মাথায় পৌঁছে যায় (১১) পেট ও মাথার জখমে এরূপ ঔষধ লাগানো যাতে পেটে বা মাথায় পৌঁছে যায়, (১২) রাত্রি ভ্রমে প্রভাতে সেহরী খেলে (১৩) সন্ধ্যা হওয়ার আগেই ইফতার করলে।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

(১) বমি উঠে নেমে গেলে (২) শারীরিক দুর্বলতা অবস্থায় প্রভাত হলে (৩) মনের ভুলে পানাহার, স্ত্রী সঙ্গম (কিন্তু পুনঃ না করা) (৪) তৈল মর্দন (৫) সূর্মা ব্যবহার, (৬) খুশবু, আতর ব্যবহার, (৭) স্বামীর ভয়ে তরকারীর স্বাদ জিহ্বায় দিয়ে ফেলে দিলে। (৮) থু-থু গিলে ফেললে। (৯) অনিচ্ছাকৃতভাবে ধুলা, মাছি, ধুঁয়া গলায় ঢুকলে (দিনে মসজিদে আগর বাতি জ্বালানো নিষিদ্ধ) (১০) পরনিন্দা ও মিথ্যা বললে (১১) হঠাৎ কানে পানি গেলে, (১২) বাচ্চাদের খাদ্য চিবালে। (১৩) দিনে স্বপ্নদোষ হলে। (১৪) মূত্রনালীতে ঔষধ দিলে।

রোযার মাকরূহসমূহ

(১) স্ত্রীকে চুম্বন, স্পর্শ ও আলিঙ্গন (২) কোন কারণ ছাড়া চুম্বন ও স্বাদ গ্রহণ (৩) ঠাণ্ডা গ্রহণের জন্য হাত, মুখ ধোয়া, কুলি করা।

রোযার কাফ্ফারা

রোযার কাফ্ফারার বিধান হল, একটি রোযার বদলে ধারাবাহিক দু'মাস রোযা রাখতে হবে। তা আদায় করতে অক্ষম হলে ৬০ জন ফকিরকে ফিৎরা পরিমাণ দান করতে হবে বা ৬০ জন মিসকীনকে পেট ভরে খানা খাওয়ালে রোযার হক আদায় হয়ে যাবে।

যে অবস্থায় রোযা কাযা করা যায় ঃ (১) পীড়িত ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির আশংকায় (২) ঋতুবর্তী নারী। (৩) মুসাফির (৪) পাগল (৫) গর্ভবতী ও স্তন্যদায়িনী জননী।

তারাবীহ্‌র নামায

তারাবীহর নামায সুন্নাত। এ নামায রমযানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রমযানে এশার নামাযের পর বিতরের আগে দশ সালামে বিশ রাকাত নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। প্রতি চার রাকাতের পর বেশ কিছুক্ষণ (চার রাকাত পড়তে যতক্ষণ সময় লাগে) বসে আরাম করে আবার নামায শুরু করবে। চার রাকাতের শেষে কোন মুনাজাত বা নির্দিষ্ট কোন দোয়া পড়া জরুরী মনে করলে ভুল হবে। তবে চুপচাপ বসে না থেকে দোয়া-দুরূদ পড়া উত্তম। জামাতে পড়া সুন্নাতে কিফায়া। এই নামাযে এক খতম কুরআন পড়া সুন্নাত। অন্যথায় সূরা তারাবী পড়লে তারাবীর নামায আদায় হয়ে যাবে।

এতেকাফ

এতেকাফ রোযাদারের জন্য এক বিশেষ নেয়ামত। রমযানের চাঁদের শেষ দশ দিন এতেকাফ করা সুন্নাত। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন।'

উল্লেখ্য, রমযানের শেষ দিন বা সাত দিন অথবা তিন দিন শবে ক্বদরের পূর্ণ সাওয়াব লাভ করার জন্য এতেকাফ' করা একান্ত কর্তব্য।

ঈদুল ফিতরের নামায

ঈদুল ফিতরের নামায ওয়াজিব। দীর্ঘ এক মাস রোযা রাখার পর শাওয়াল মাসের পহেলা তারিখে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয় তাই ঈদুল ফিতরের নামায হিসেবে পরিচিত।

১ম, ২য় ও ৩য় তাকবীর ঃ সর্বপ্রথমে ইমাম সাহেব ছানা পড়ে উচ্চঃস্বরে তিনবার তাকবীর বলবেন, মুক্তাদীগণ চুপে চুপে তাকবীর বলবে। প্রত্যেক

তাকবীরের সময় সকলেই হাত কর্ণমূল পর্যন্ত উঠাবে। কিন্তু হাত বাঁধবে না; বরং নীচে ছেড়ে রাখবে। তৃতীয়বারে হাত বেঁধে যথারীতি ফাতিহা ও সূরা পাঠ করে রুকু' সিজদাহ করবে।

৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তাকবীর ঃ ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে সূরা ও কেরাত পড়ার পর পুনরায় তিন তাকবীর বলবে। এ তিন তাকবীরেও সকলে কর্ণমূল পর্যন্ত হাত উঠাবে কিন্তু হাত বাঁধবে না। অতঃপর ৪র্থ তাকবীর বলে রুকুতে যাবে এবং রুকু সিজদাহ ইত্যাদি করে নামায শেষ করবে। তারপর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে দু'টি খুৎবাহ পাঠ করবেন। আর মোক্তাদিগণ চুপ করে শ্রবণ করবে এবং খুৎবাহ শেষে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করবে। এ নামায তাহযীব তামাদ্দুনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

কুরবানী বা ঈদুল আযহা

কুরবানী বান্দার জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এক পরীক্ষামূলক এবাদত। এ কুরবানীর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তার বান্দাহকে পরীক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর দিনগুলোতে আল্লাহ্ পাকের নিকট কুরবানীর চাইতে অন্য কোন জিনিষ অধিক প্রিয় নয় এবং কুরবানীদাতাকে কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক এক একটি নেকি দান করেন।

প্রকাশ থাকে যে, ঈদুল আযহার নামাযও ঈদুল ফিতরের নামাযের ন্যায় যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ হতে ১৩ই যিলহজ্ব 'আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর জোরে তাকবীর বলা ওয়াজিব। একে তাকবীরে তাশরীক্ব বলে।

তাকবীর

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

কুরবানীর দোয়া

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাছ্ সামা-ওয়াতি ওয়াল্ আরদা 'হানিফাওঁ ওয়ামা-আনা-মিনাল মুশ্‌রিকীন, ইন্না- সালা-তী ওয়া নুসুকী ওয়া মা'হ্ইয়া-ইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীনা। লা-শারীকা লাহু- ওয়া বিযা-লিকা উমিরতু ওয়া আনা- মিনাল মুসলিমীনা। আল্লা-হুম্মা মিনকা ওয়া-লাকা বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার, উচ্চারণের সময়ে কুরবানীর পশু জবেহ করবেন এবং জবেহ করার পরে নিম্নের দোয়া পাঠ করবেন।

কুরবানীর দ্বিতীয় দোয়া

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّیْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বালহু মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন হাবীবিকা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া খালীলিকা ইবরাহীমা আলাইহিমা চ্ছালাতু ওয়াস্‌সালাম।

এশরাকের নামায

এশরাকের নামায (সূর্যোদয় স্পষ্ট হওয়া হতে আনুমানিক ৯টা পর্যন্ত)

পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের পর সূর্য স্পষ্ট হলে, দুই নিয়তে চার রাকাত বা এক নিয়তে কমপক্ষে দু'রাকাত নামায পড়ার বহু ফজিলত আছে। "রাক্‌আ'তাই সালাতিল এশরাক" (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ২ রাকাত এশরাকের নামায আদায় করতেছি) এই বলে নিয়ত করবে। প্রতি রাকাতে তিন বার করে সূরা ইখলাস পড়া অতি উত্তম। এছাড়া অন্য যে কোন সূরা কেরাত দ্বারাও এ নামায আদায় করলে অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

চাশতের নামায

(সূর্য গরম হওয়ার পর সকাল ৯-১০টা থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত)

চাশতের নামায চার, আট বা বার রাকাত পড়া যায়। "আরবায়া' রাকাআতি সালাতুদ্দোহা" এ রকম নিয়ত করতে হবে।

যাওয়ালের নামায

(দ্বিপ্রহর থেকে আছর পর্যন্ত সময়)

পশ্চিম দিকে সূর্য কিছুটা হেলে পড়লেই যাওয়ালের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং আছরের পূর্ব পর্যন্ত বজায় থাকে। নিয়তে শুধু ছালাতিয যাওয়াল বলবে। সূরা

ফাতিহার সাথে যে-কোন সূরা মিলিয়ে এ নামায আদায় করা যায়। দুই দুই রাকয়াতে কমপক্ষে চার রাকায়াত আদায় করতে হয়।

আওয়াবীন নামায

(মাগরিবের সুন্নাতের পর থেকে এশা পর্যন্ত)

আওয়াবীনের নামায দু'রাকাত করে তিন সালামে ছয় রাকাত পড়া অধিক প্রচলিত। "রাকআতাই ছালাতিল আওয়াবীন" (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ২ রাকাত আওয়াবীনের নামায আদায় করতেছি) বলে নিয়ত করবে।

তাহাজ্জুদ নামায

(অর্ধ রাতের পর থেকে সুবহে সাদেকের আগ পর্যন্ত এর ওয়াক্ত)

উল্লেখ্য যে, তাহাজ্জুদ নামায সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ্। মোট ১২ রাকাত নামায। দু'রাকাতের নিয়তে চার বা আট রাকাত পর্যন্ত পড়া চলে। নামাযের তরীকা অন্যান্য নামাযের মতই, তবে অনেকের মতে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস পড়া উত্তম। তবে দীর্ঘ আয়াত দ্বারা এ নামায আদায় করলে অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

মাসবুকের নামায

[ইমামের সাথে প্রথমে নামায না পাওয়া]

নামাযের জামায়াত শুরুর দিকে কেউ যদি এক বা একাধিক রাকাত নামায না পায়, সেই ব্যক্তি মাসবুক। শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে বসে থাকবে। ইমাম ডান দিকে গিয়ে প্রথমে সালাম শেষ করলে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে ছানা, আউযু ইত্যাদি পড়বে অথবা যে কয় রাকাত নামায ছুটে গেছে তা একা পূরণ করে নামায শেষ করতে হয়।

লাহিকের নামায

(ইমামের সাথে নামায শুরুর পর ওযূ ভঙ্গের কারণে নামায ছুটে যাওয়া)

প্রথম থেকেই কেউ জামায়াতে শরীক ছিল। ওযূ ভেঙ্গে যাবার কারণে চুপে চুপে গিয়ে ওযূ করে এসে আবার জামায়াত ধরবে। কিন্তু মাঝখানে ছেড়ে যাওয়া অংশ "লাহিক্ব" ব্যক্তি ছুরা ব্যতিরেকে আদায় করে নিবে। যদি ফিরে এসে দেখে যে, ঈমামের নামায শেষ হয়ে গেছে, তবে একাকী বাকী নামায সূরা না পড়ে আদায় করে নিলে চলবে।

কাযা নামায আদায়ের পদ্ধতি

ওয়াক্ত মত কোন বিশেষ কারণে নামায না পড়তে পারলে অন্য সময় তা' পড়ে নেয়াকে কাযা নামায বলে। ফজরের কাযা নামায সুন্নাতসহ দুপুরের আগে পড়ে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ ওয়াক্তের বেশি নামায কাযা হলে তা' আদায় করতে গেলে বর্তমান নামায কাযা হওয়ার ভয় থাকলে শেষ ওয়াক্তের কাযাটা পড়ে নিয়ে বর্তমান নামায আদায় করবে, পরে বাকি কাযাগুলো পড়ে নিলে চলবে।

পাঁচের কম নামায কাযা হলে বর্তমান নামাযের আগে পড়ে নেয়া অবশ্য কর্তব্য।

শোকরের নামায

আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতে এ বিশ্ব ভরপুর। মানুষ প্রতিনিয়ত আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত ভোগ করতেছে। তাই শোকর আদায় করার জন্য, দুই রাকাত নামায যে কোন সূরা দিয়ে পড়তে হবে। সালাম ফিরিয়ে কিছু সময় দোয়া দুরূদ পড়ে মুনাজাত করবেন। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতের শোকরিয়া আদায় করলে উহা বহুগুণে বর্ধিত হয়। নিয়ামত বলতে ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা, জায়গা-জমি, স্ত্রী-পুত্র, গাড়ী-বাড়ি, পোষাক ইত্যাদি বুঝায়। বিপদ আপদ দুঃখ-কষ্ট, রোগ শোকও প্রকারান্তরে আল্লাহর নেয়ামত, উহা হতে উদ্ধার পেয়ে শোকর আদায় করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন এবং বান্দার গুনাহ মোচন করে দেন।

সালাতুত তাসবীহের নামায

সালাতুত তাসবীহের নামায হযরত আদম (আ.) পড়তেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সর্বদা এ নামায পড়তেন। ইহা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য অতি উৎকৃষ্ট এবাদত। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি এই নামায পড়বে তার ছগিরা, কবিরা, জানা, অজানা পূর্বের ও পরের জীবনের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন এবং জান্নাতে দাখিল করাবেন। এই নামায প্রত্যহ একবার পড়বেন, অক্ষমে সপ্তাহে একবার, নতুবা মাসে একবার নতুবা বৎসরে একবার, তাও যদি সম্ভব না হয় তবে সারা জীবনে একবার হলে পড়তে হবে নতুবা বিশেষ করুণা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

ছালাতুত তাসবীহ্ নামায আদায় করার নিয়ম ঃ এ নামায আদায় করার সময় এক সাথে চার রাকায়াতের নিয়ত করতে হয়। এ নামাযের জন্য কোন সূরা নির্দিষ্ট নেই। অন্যান্য নফল নামাযের ন্যায় যে কোন সূরা দিয়ে এ নামায আদায় করা যায়। তবে এ নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতে ৭৫ বার করে মোট ৩০০ বার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ.

উচ্চারণ ঃ সুবহাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার।

মুসাফিরের নামায

আল্লাহর পক্ষ থেকেই মুসাফিরের জন্য নামাযকে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এ নামাযকে কছরের নামায বলা হয়। স্বীয় বাসস্থান ত্যাগ করে তিনদিন তিন রাতের পথ আনুমানিক ৪৮ মাইল দূরবর্তী কোন স্থানে গমনের নিয়ত করে বের হলে সেই ব্যক্তি মুছাফির হিসেবে গণ্য হবে। যদি ঐ ব্যক্তি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে পনের দিন থাকার নিয়ত না করে তবে তাকে ভ্রমণ শুরু করার পর থেকে বাড়ীতে না ফিরা পর্যন্ত চার রাকায়াতের স্থানে দুই রাকয়াত কছর নামায পড়তে হবে। আর একে কছর নামায বলা হয়। কছর নামায কাযা হলে উহার কাযাও কছর পড়তে হয়। নিয়তের মধ্যে দুই রাকয়াত কছর বলে নিয়ত করতে হবে। দুই রাকয়াত, তিন রাকয়াত ও সুন্নাত, ওয়াজিব নামাযের কছর পড়া যায় না।

হাজতের নামায

সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এ আমল করা হয়। কারো কোন হাজত দেখা দিলে উহা পুরণ হবার নিয়তে ওযূ করে বিশুদ্ধ অন্তরে দুই রাকয়াত নফল নামায হাজতের নিয়তে আদায় করবে। নামায শেষে তওবাহ্ এস্তেগফার পাঠ করে কয়েকবার "ছানা" ও দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর আল্লাহর নিকট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রার্থনা করবে।

কুসূফ বা সূর্যগ্রহণের নামায

কুসূফ শব্দের অর্থ হল সূর্যগ্রহণ। সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকাত নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযকে কুসূফের নামায বলে। নিয়ত অন্যান্য নামাযের মতই শুধু "ছালাতুল কুসূফে" উল্লেখ করবে। এ নামায জামায়াতে পড়া

উত্তম, তবে একাও আদায় করা যায়। মেয়ে লোকেরা ঘরে বসে এ নামায পড়বে। এ নামাযে সূরা-কেরাত দীর্ঘ পড়তে হয়, চুপে চুপে সূরা পড়তে হয়, আর রুকু সিজদাহ্ লম্বা করে পড়া উত্তম।

খুসূফ বা চন্দ্রগ্রহণের নামায

খুছুফ শব্দের অর্থ হল চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণের সময় দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নাত। এই নামাযকে খুছুফের নামায বলে। নিয়ত অন্যান্য নামাযের মতই শুধু "ছালাতুল খুসূফে" উল্লেখ করবে। এ নামায জামায়াতে পড়া উত্তম, তবে একাও পড়া যায়। মেয়ে লোকেরা ঘরে বসে এ নামায আদায় করবে। এ নামাযে সূরা কেরাত দীর্ঘ ও চুপে চুপে পড়তে হয়, আর রুকু সিজদা লম্বা করে পড়া উত্তম।

ইস্তেখারার নামায

প্রত্যাশিত বিষয় লাভের জন্য এ নামায পড়া হয়। কোন আরোধ্য কাজ বা কোন উদ্দেশ্য ভাল হবে কি মন্দ হবে পূর্বাহ্নে তার ইঙ্গিত লাভ করার জন্য দুই রাকয়াত নামায পড়ার নাম ইস্তেখারার নামায।

ইস্তেখারা করার নিয়ম

শোয়ার পূর্বে এশার নামাযের পর পবিত্রাবস্থায় ইস্তেখারার নিয়ত করে এ নামায পড়তে হয়। এ নামাযের নিয়তও অন্যান্য দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের ন্যায়। নামের স্থলে সালাতিল ইস্তেখারা বলবে। ইহা যে কোন সূরা দ্বারা পড়া যায়। নামায আদায়ের পর সূরা ফাতিহা ও কয়েকবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে প্রার্থনা করবে। তারপর নিম্নোক্ত দোয়াটি খুব মনযোগের সাথে পাঠ করবে ও তওবাহ্ ইস্তেগফার পাঠ করে ডানকাতে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। আল্লাহর ইচ্ছায় স্বপ্নযোগে অবশ্যই কোন না কোন আভাস পাওয়া যাবে।

ইস্তেখারার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ

اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ

لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيْهِ. وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعِيْشَتِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ.

উল্লেখিত দোয়ার মধ্যে যখন هٰذَا الْاَمْرَ বলবে তখন ঐ কাজের খেয়াল করবে। এরপর পাক পবিত্র বিছানায় কেবলামুখি হয়ে শুয়ে পড়বে। ঘুম থেকে ওঠার পর অন্তর যেদিকে ধাবিত হয়, তাই করবে। যদি এ রকম একবার করার পর অন্তরে অনিশ্চয়তা বা উৎকণ্ঠা থেকে যায় তবে এভাবে সাত দিন করবে। তবে আশা করা যায় সংশ্লিষ্ট কাজ ভাল না মন্দ তা অবশ্যই বোঝা যাবে। কোন কারণবশতঃ এস্তেখারার নামায আদায় করতে না পারলে শুধু দোয়াটি ৩বার পাঠ করে এস্তেখারার নিয়্যাত করে শয়ন করবে। আল্লাহ্র রহমতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে। এস্তেখারা করা কোন সময় বাদ দেবে না। যেহেতু এস্তেখারা করা সুন্নত। (দুররে মুখতার)

এস্তেখারার দোয়ার অর্থ

হে আল্লাহ্! আমি আপনার মহান দয়ার প্রত্যাশী। আপনি অসীম ক্ষমতাধর, আমি অক্ষম। আপনি সব কিছু জ্ঞাত, আমি অজানা। আপনি গোপন ও অদৃশ্য বিষয় সমূহও পুরোপুরি অবগত। হে আল্লাহ্! যদি আমার এ কাজটি দ্বীনের জন্য, আমার পার্থিব স্বার্থের উপযোগী এবং আমার ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর মনে করেন তবে আপনি এটি আমার জন্য নির্ধারিত করে দিন এবং সহজ উপায় করে দিন এবং এর ভেতরে আমার জন্যে কল্যাণ ও বরকত দান করুন। পক্ষান্তরে, এ কাজ যদি আমার দ্বীনের জন্য পার্থিব স্বার্থের বিপরীত এবং পরিণামের জন্য মঙ্গলহীন ও অকল্যাণকর হয়, তবে এ কাজকে আমার নিকট থেকে দূরে রাখুন আর যার ভেতরে আমার জন্য কল্যাণ করেছে তা আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন। এ দোয়া পাঠ করে উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ্র দরবারে রোনাজারী সহকারে প্রার্থনা করবে।

মৃত্যুর সময়ের নামায

কারো নিশ্চিত মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে অর্থাৎ, কোন ব্যক্তির ফাঁসির নির্দেশে অথবা অন্য কোন কারণে মৃত্যু নিকটবর্তী হলে, ওযূ করে বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে দুই রাকআত নামায পড়বে এবং কান্নাকাটি করে গুনাহ মাফের

জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। ইহা জীবনের শেষলগ্নে উত্তম আমল হিসেবে আমলনামায় লিখা হতে থাকবে।

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিলআমানি ওয়াল-ঈমানি ওয়াস সালামাতি ওয়াল্-ইসলামি রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহু।

খাওয়া শুরু করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহি।

বিশ লাখ নেকীর দোয়া

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ.

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

আশি বছরের গুনাহ্ মাফের দুরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাল্লীম তাছলী-মা।

ফযিলত ঃ শুক্রবার দিন যে ব্যক্তি 'আছর নামাযের পর দুনিয়াবী কোন কথাবার্তা না বলে স্থান পরিবর্তন করার পূর্বে ৮০ বার উপরোক্ত দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক তার ৮০ বছরের (ছগীরাহ) গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং ৮০ বছরের নেকী দিবেন। (দুররে মানছুর)

দুর্ঘটনা থেকে হেফাজতের দু'আ

হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি একবার এ দু'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত দুর্ঘটনা থেকে তাকে হেফাজত করবেন।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا
شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতা রব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়াআনতা রব্বুল আরশিল কারীম। মা শা আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। 'আ'লামু আন নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর ওয়ান নাল্লাহা ক্বদ আহাত্বা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমা আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শাররি নাফসি ওয়ামিন শাররি কুল্লি দাববাতিন আনতা আ-খিজুম বি নাসিয়াতিহা ইন্না রব্বি 'আলা সিরাতিম মুসতাক্বীম।

কাফেরদের থেকে সাবধান

আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই যারা কাফির তাদেরকে ভয় দেখাও আর না দেখাও (একই সমান) তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে না আল্লাহ্ পাক তাদের অন্তরাত্মায় ও কর্ণসমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চক্ষুসমূহের উপর, মোহর এটে দিয়েছেন সে জন্য তাদের কঠোর শাস্তি হবে।

মানুষদের মধ্যে কেহ-কেহ বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করি, অথচ তারা বিশ্বসী ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্ ও (খাঁটি) ঈমানদার ও মুসলমানদেরকে (শুধু) ধোঁকাই দিচ্ছে আর সে ধোঁকা যে, নিজেদেরকে দিচ্ছে তা-তারা বুঝেও না।

তাদের অন্তরসমূহে (শয়তানী ধোঁকার কঠিন) রোগ বিদ্যমান, সে রোগ (আল্লাহ পাক দিন দিন) আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং (এ জন্য) তাদের ভীষণ শাস্তি রয়েছে (পরকালে)। যেহেতু তারা যা বলে তা মিথ্যাই বলে এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে যে, আমরাই শান্তি স্থাপনকরী।

এ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন যে, সাবধান! (ঈমানদার মুসলমানরা) নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি-বিশৃঙ্খল সৃষ্টিকারী কিন্তু তা-তারা বুঝেই না।

(সূরা বাকারা, ৬-১২ আয়াত)

তাই উল্লেখ্য যে, এই স্বভাবের মানুষ দেশ-বিদেশে বহু আছে, অতএব- আল্লাহ্ পাক খাঁটি ঈমানদার ও মুসলমানদেরকে তাদের থেকে সাবধান করে চলতে বলেছেন।

কাফের কারা ? সংক্ষিপ্ত পরিচয়

যারা আল্লাহ্, রাসূল-নবী, আসমানী কিতাব, বেহেশত-দোজখ, পরকাল, ফেরেশতাগণ ও শরীয়তের নির্দেশের অবিশ্বাসী হয়, মানে না, তাদেরকে কাফির বলা হয়।

কাফেরদের স্বরূপ

সূরা বাকারার ৬-১২ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যাদের অন্তরাত্মাও কর্ণ সমূহের উপর মোহরাঙ্কিত করে রাখা হয়েছে এবং চক্ষুসমূহে আবরণ বা পর্দা পড়ে রয়েছে, তাদের সেই জন্য আল্লাহর কুদরতের জাহেরী ও বাতেনী বিষয়গুলো অন্তরাত্মায় ইবাদত-যিকিরে অনুধাবন- অনুস্মরন করতে না পারে ও অন্তর চক্ষে-কর্নেও যেন তা বুঝতে না পারে।

অর্থাৎ- ঐ মহা মূল্যবান ইন্দ্রীয় অনুভূতি, অন্তরাত্মা, কর্ণ ও চোখগুলোতে জাহেরী সত্যানুভূতি, ধর্মোপদেশ না পাবার অন্ধত্যতাও বাতিনী বিষয়গুলোতে সত্য, মিথ্যা, ভাল-মন্দ, বুঝবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং তার জন্যই তাদের জীবনাচার স্বভাবস্বরূপ পশুসুলভ হবারই যোগ্যতা বহন করবে।

পশু ও পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মানুষ যারা

মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ এবং অবশ্যই আমি নরকের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। তাদের "অন্তরসমূহ্" আছে তা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না এবং "চক্ষুসমূহ আছে" তা দ্বারা দেখতে পায় না এবং তাদের "কর্ণসমূহ" আছে তা দ্বারা শুনতে পায় না। উহারাই (বাঘ-ভালুক, শৃগাল-কুকুর) চতুষ্পদ পশুর তুল্য, বরং তারা তদপেক্ষা বিভ্রান্ত, যারা অমনোযোগী।"

ফলত ঃ ইহাই অন্তকরণ ও কর্ণের মোহরাঙ্কিত করা এবং চক্ষুসমূহে আবরণ থাকার প্রকৃত অর্থ। (সূরা আ-রাফ ১৭৯ আয়াত)

সে জন্যই আল্লাহ্ পাক পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন ঃ "তাদের অন্তর সমূহ্ বধির (অন্তরে আল্লাহর দোয়া জপন হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না) তারা মুক (অর্থাৎ-বোবা অন্তর, অন্তরে আল্লাহ্ পাককে যেভাবে স্বরণ করা দরকার তারা তা পারে না) অন্ধ (আল্লাহ্ প্রদত্ব জ্ঞানগুলো অন্তরের চক্ষুতে ফোঁটায় না, তাই আল্লাহ্র অসীম কুদরত দেখবার জন্য তারা অন্ধ) অতএব তারা অল্লাহর প্রতি ফিরবে না"। (সূরা বাক্বারা ১৮ আয়াত)

এ সকল মানুষ হতে সাবধান। কেননা- তারা পশু ও পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাজ ও যিকিরে আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যে
কথোপকথনের প্রথম স্তর

মহান আল্লাহ্ নামাজকে যিকির হিসেবেও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অর্থ ঃ নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, আমার যিকির (স্মরণ) করবার জন্য।

(সূরা ত্বহা, ১৪ আয়াত)

সে জন্যই এখানে শিরোনামে নামাজের সহিত "যিকির" উল্লেখিত হলো।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলে করিম (সাঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ বলেন "কুস্‌সিমাতিস্ ছালতু বাইনী ও বাইন আব্দী নিছ্ফাইন ওয়ালী আবদী মা-সা আ'লানী।" অর্থাৎ "নামাজ" আমার ও আমার বান্দার মধ্যে অর্ধেক করে ভাগ করা হয়েছে, আর আমার বান্দা আমার কাছে যা চাইলো তা-ই, তার জন্য রইলো।"

বান্দা নামাজ বা যিকিরে সূরা ফাতিহা পাঠে যখন বলে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ " আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।"

অর্থ ঃ "যাবতীয় প্রশংসা (শুধু) আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি সারা জাহানের রব।" তখন হাদিসে কুদসীতে জবাবে আল্লাহ পাক বলেন ঃ * حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ **উচ্চারণ ঃ** "হামিদানী আবদী।" অর্থ ঃ "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো।" তৎপর-বান্দা সূরা ফাতিহায় যখন বলেন ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ **উচ্চারণ ঃ** "আর্‌রাহ্ মানির্‌রাহিম।" অর্থ ঃ (আল্লাহ্ অনেক) "মেহেরবান ও দয়াময়।" তখন হাদিসে কুদসীতে জবাবে মহান আল্লাহ বলেন ঃ اَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ **উচ্চারণ ঃ** আছনা আ'লাইয়্যা আব্‌দী।" অর্থ ঃ "আমার বান্দা আমার

গুণ গাইলো।" বান্দা যখন সূরা ফাতিহায় বলেন ঃ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ উচ্চারণ ঃ "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন।" অর্থ ঃ (তিনি) "বিচার দিনের মালিক।" তখন হাদিসে কুদসীতে জবাবে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ উচ্চারণ ঃ "মাজ্জা-দানী আব্দী।' অর্থ ঃ "আমার বন্দা আমার গৌরব বর্ণনা করলো।" অতঃপর ঃ বান্দা যখন সূরা ফাতিহায় বলেন ঃ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ উচ্চারণ ঃ "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন।" অর্থ ঃ "আমরা (একমাত্র) তোমারই ইবাদত করি, আর (শুধু) তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" তখন হাদিসে কুদ্সীতে আল্লাহ্ পাক জবাবে বলেন ঃ هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَا سَئَلَ _ উচ্চারণ ঃ "হা-জা-বাইনী ওয়া বাইনা আব্দী ওয়ালী আব্দী মা-সা'লা।" অর্থ ঃ "এ বিষয়টা আমার ও আমার বান্দার মাঝেই রইলো, আর আমার বান্দার জন্য তা-ই, যা-সে চাইলো।"

তৎপর বান্দা যখন সূরা ফাতিহা পাঠে বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ * (اٰمِيْنَ)

উচ্চারণ ঃ "ইহ্দিনাছ্ ছিরাত্বল্ মুস্তাক্বীমা ছিরাত্বাল্ লাযিনা আন্ আ'ম্তা আ'লাইহিম্ গাইরিল্ মাগ্দুবি আ'লাইহিম্ ওয়ালাদ্ দাল্লীন।" (আমিন!) অর্থ ঃ "আমাদেরকে সরল মজবুত পথ দেখাও, ঐসব লোকদের পথ যাদেরকে তুমি নি'য়ামত দিয়েছ। যাদের উপর গজব পড়েনি, আর যারা পথ হারা হয় নি।" তখন হাদিসে কুদ্সীতে জবাবে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ-

هٰذَا لِعَبْدِىْ وَلِعَبْدِىْ مَاسَئَلَ *

উচ্চারণ ঃ "হাজা লী আব্দী ওয়ালী আবদী মা সা'য়ালা।"

অর্থাৎ "এটা আমার বান্দার জন্যই রইলো, আরে আমার বান্দার জন্য তা-ই, যা-সে চাইলো।" (মুসলীম শরীফ, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সূরা ফাতিহা এবং হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাকের স্বরণে ও তাঁর প্রতি মহব্বতের (বান্দার) এমন "নূর" রয়েছে যে, বান্দার অন্তরের অন্তস্থল, অন্তরচোখ ও অন্তরকানে ঈমানের বারুদ থাকলে

এবং নামাজে বা যিকিরে, সূরা ফাতিহা পড়ার সময় আল্লাহ্‌র প্রাণপ্রিয় কথা গুলোর দিকে মনোযোগ থাকলে আল্লাহ্‌র সাথে মহব্বতের এমন আগুন বা "নূর" জ্বলে উঠবে যে, আবেগের গভীরতায় বান্দা মনিবের অতি কাছে বলে অনুভব করেই বান্দা ঐ "নূরে" ডুবন্ত হয়ে থাকবে। এবং নিজেকে (ধ্বংস) মনে করবে। অতঃপর নিয়ম মত অবশিষ্ট অংশ সেরে তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে।

নামাজ ও যিকিরে আল্লাহ্ এবং বান্দার মধ্যে কথোপকথনের দ্বিতীয় স্তর

তাশাহ্‌হুদ বা আত্তাহিয়্যাতু পড়ার বৈঠকে ঃ

মানবশ্রেষ্ঠ মহানবী (সাঃ) যখন মে'রাজে সপ্তম আকাশে হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করে কা'বা কাউসাইনে পৌছেন, সেখানে পরম করুনাময় আল্লহ্‌র "নূর" প্রকাশমান, সেই "নূরকে" দেখে মস্তক সেজদায় রাখলেন, তখন শব্দ হলো "ওহে বন্ধু" তুমি আমার জন্য কি উপহার এনেছ! তদুত্তরে মহানবী (সাঃ) বলছিলেন ঃ " আত্তাহিয়্যাতু"

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ*

উচ্চারণ ঃ "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছালাওয়াতু ওয়াত্বয়্যিবাতু "-

অর্থ ঃ "সমুদয় মৌখিক ইবদাত, দৈহিক আরাধনা এবং আর্থিক উপাসনা একমাত্র আল্লাহর জন্য।" তদুত্তরে আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ*

উচ্চারণ ঃ "আস্‌সালামু আ'লাইকা আয়্যূহান্ নাবীউ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

অর্থ ঃ "হে নবী! আপনার প্রতি অফুরন্ত শান্তি, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত নাজিল হউক।" উত্তরে পুনরায় মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ*

উচ্চারণ ঃ "আস্‌সালামু আ'লাইনা ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিছ্ ছালিহিন।"

অর্থ ঃ আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি নাযিল হউক।" পরিশেষে ফেলেশতারা বললেন ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ * وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ *

উচ্চারণ ঃ " আশ্‌হাদু আন্‌ লা-ই লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান্‌ আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।"

অর্থ ঃ " সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেহই ইবাদতের যোগ্য নেই এবং ইহাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

অতঃপর আল্লাহ্‌ পাক বললেন ঃ "ওহে বন্ধু" এখানে (সপ্তম আকাশে) "ফেরেশতাগণ" "আপনি" ও "আমি" "আত্তাহিয়াতুর" মাধ্যমে যে সমস্ত কথোপকথন হলো- উহা প্রত্যেক নামাজের বৈঠকে পড়লেন।

তৎপর- আল্লাহ্‌ পাক আরো বললেন ঃ"ওহে বন্ধু" আপনার মহব্বতেই উভয় জগৎ সৃষ্টি করেছি। সুতরাং এখন এই আকাশেই আপনি আমার নিকট যা চাইবেন, তা-ই পাবেন।' সুব্‌হানাল্লাহ্‌!

সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌ পাকের সহিত কথোপকথন মে'রাজের সেই সুব্যবস্থার উত্তম স্থানটি হলো এই "নামাজ"। তাই গভীর ভালবাসা নিয়ে, মনের বিভিন্ন সংযোগকে ছিন্ন করে অন্তরাত্মার ধ্যানে তন্ময় হয়ে "নামাজ" আদায় করলে অবশ্যই আল্লাহ্‌র জলন্ত "নূর" ক্বালবে প্রকাশ হবেই এবং ক্বালবে আল্লাহ্‌ পাকের মহা আরশ স্থাপিত হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য প্রেরণা হবেই। অতঃপর নামাজের অবশিষ্ট নিয়মগুলো পালন করত ঃ নামাজ সম্পন্ন করতে হয়।

উল্লেখ্য ঃ যেহেতু কাঠ মোল্লারা এবং যারা শয়তানের জালে আটকা পড়ে মন এদিক ওদিক ঘুরায়, তাদের আল্লাহ্‌ পাকের সহিত মহব্বত ক্বালবে জাগ্রত করে না বলেই ক্বালবে আল্লাহ্‌র আরশ ও মেরাজ তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব হয় না।

নামাজ ও যিকির করবার আন্তরিক স্থানসমূহের পরিচয়

নফ্‌সের অংশগুলো সহ ছয় লতীফার স্থানগুলো চিনে নিয়ে মনে রেখে, প্রত্যেক ইবাদত যিকিরসমূহ আদায় করতে হয়। নফস পাঁচ প্রকার যথা ঃ (১) নফ্‌সে আম্মারা, এটা নভীর নিম্নভাগে শয়তানের প্ররোচনার স্থান। (২) নফ্‌সে লাওয়্যামা, ইহা সৎ অসতের ভাবনার মিশ্রণ কেন্দ্র আকাশের নিচে জমিনের উপরে এটার স্থান। (৩) নফ্‌সে মোৎমাঈন্যা, এটা শান্তিময় নফ্‌স, যার স্থান সপ্তম আকাশে আরশের নিকটে। (৪) নফ্‌সে মোলহেমো, ইহা

রুহের মূলের মূল স্থানের শেষ সীমায় এর স্থান। (৫) ও নফসে মোহাম্মেদীয়ার স্থানও রুহে মূলের মূল স্থানের এই শেষ সীমায়, এটা নবী রাসূলদের নফস। সাধারণ মানুষের নফ্স নয়।

অর্থাৎ মনে রাখতে হবে যে, মানবদেহে ঐ নফ্সগুলো সহ ছয়টি মূল্যবান লতীফা আছে- ঐ গুলোতে গভীরভাবে ধ্যান মন ঠিক করত ঃ সংযোগ দিয়ে সকল ইবদাত-যিকির করতে হবে, যা মানবদেহের "অন্ত রাত্মা," ইবাদতের ধ্যানের স্থান।

ছয় লতীফার স্থানগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো যথাঃ (১) লতীফায়ে নফ্স, (নাভীর নিম্ন ভাগে) (২) লতীফায়ে ক্বালব, (বাম দুধির দু'আঙ্গুলীর নিচে) (৩) লতীফায়ে রুহ্, (ডান দুধির দু' আঙ্গুলীর নিচে) (৪) লতীফায়ে সের (বুকের বা সীনার বা পার্শ্বে) (৫) লতীফায়ে খফী, (কপালের মাঝে হেলবিয়ায়) (৬) লতীফায়ে আখফা, (মাথার তালুতে দুগদুগীর নীচে)

ইসলামী জ্ঞানের যাকাত

লক্ষ্যণীয় যে, প্রত্যেক বস্তুরই যাকাৎ আছে যেমন ঃ ধন সম্পদের যাকাৎ সাহেবে নিসাব হওয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় খরচ বাদে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা ঐ পরিমাণ মূল্যের অর্থ পূর্ণ এক বৎসর কাল জমা থাকলে তাকে সাহেবে নিসাব বলা হয়। ঐ পরিমান সম্পদ যার মওজুদ থাকে তার উপর যাকাৎ দেয়া ফরজ।

তেমনি মানব দেহেরও যাকাৎ দিতে হয়। আর তা হলো- রোজা পালন করা। সেরুপেই হাদিস কুরআনের জ্ঞানগুলো অতি গভীর, এই গভীর জ্ঞান গুলোরও যাকাৎ আছে। তা হলোঃ কুরআন ও হাদিস মোতাবেক জ্ঞানের যাকাৎ। যা কুরআন ও হাদিস মোতাবেক জ্ঞানের গভীর গবেষণা, সাধনা, চিন্তা চেতনা। এ কারণেই মহানবী (সাঃ) সারা জীবন সর্বদাই চিন্তিত ও ধ্যানে মশগুল থাকতেন। যে জ্ঞান মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে দান করেছেন। উহাতে গভীরভাবে গবেষণা, চিন্তা-চেতনা-সাধনায় যেন, আল্লাহর সৃষ্ট বিশ্ব জগতকে চিনে নিয়ে উপসনায় মহান আল্লাহকে চিনতে পারা যায়। ইহাই হলো এ ইসলামী জ্ঞানের যাকাৎ। মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً *

উচ্চারণ ঃ "তাফাক্কুরু সা'য়াতিন খায়রুম মিন্ ইবাদাতী সিত্তিনা সানাতান।"

অর্থ ঃ এক মুহূর্ত জ্ঞান জগৎ নিয়ে চিন্তা করা ষাট বছর নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম

জ্ঞান দু'প্রকার। যথা ঃ

মহান আল্লাহ সম্পর্কীয় এবং জগৎ সম্পর্কীয়। আল্লাহ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে, তাঁর সত্তা, তাঁর গুণসমূহ ও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়সমূহ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের গন্ডির মাঝে আবদ্ধ। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *

উচ্চারণ ঃ "ইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইয়্যিন আ'লীম।" অর্থ ঃ মহান আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা আল মুজাদালাহ ঃ ৭)

মহান আল্লহ্ আরো বলেছেন ঃ

وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا *

উচ্চারণ ঃ ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বদ আহাত্বা বিকুল্লি শাইয়্যিন ইল্‌মা।

অর্থ ঃ "মহান আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে।"

(সূরা ত্বালাক ঃ ১২)

দুনিয়ার বৈষয়িক জ্ঞান হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া সীমিত ও আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত জ্ঞান। এ জ্ঞান যেমন অর্জিত হয় তেমন বিলোপও হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছনে ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ *

উচ্চারণ ঃ ওয়ালা ইউহিতুনা বিশাইয়্যিম মিন্ ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শাআ। অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র জ্ঞান ভান্ডার থেকে কেউ কিছুই নিজ আয়ত্বে আনতে পারে না, তবে তিনি দয়ার্দ্র হয়ে যা দান করেন। (বাকারা-২৫৫)

আল্লাহ সন্ধানীদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া জ্ঞান ও হেদায়েতকে পথ প্রদর্শক হিসাবে নির্ধারিত করা এবং স্বরণ রাখা যে, আল্লাহ আমার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল কিছু দেখেন। মানুষের জ্ঞান ও আমলের একটা বহির্গত ও আর একটা ভিতরগত দিক রয়েছে। যেমন ঃ কালেমা শাহাদতের বহির্গত দিক হচ্ছে জবানে উচ্চারণ করা এবং তার সত্যতা মান্য করা। ভিতরগত বা গোপনীয় দিক হচ্ছে অর্থ হৃদয়াঙ্গম করে তাতে সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ভিতরগত যথার্থতার বিদ্যা ছাড়া বহির্গত সাজ-গোজ ধোঁকাবাজী ছাড়া অন্য

কিছুই নয়। সুতরাং সত্য তালাশকারীদের জন্য বহ্যিক ও অভ্যন্তরীন উভয় দিকই সজ্জিত রাখতে হবে।

জ্ঞান দু'প্রকার, যথা ঃ শরীয়তের ও হাকীকতের জ্ঞান। হাকীকতের জ্ঞানের তিনটি রুকন বা খাম্বা আছে।

১. আল্লাহ্‌র জাতিসত্তা, তাওহীদ বা একত্বাদ এবং শিরক বিষয়ের জ্ঞান।

২. মহান আল্লাহ্‌র সিফাত বা গুণসমূহ্ এবং আহ্‌কামে জ্ঞান।

৩. মহান আল্লাহ্‌র কাজসমূহ্ ও তাঁর কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

আল্লাহ্ পাকের জাতি সত্তা বিষয়ক জ্ঞান হচ্ছে, তিনি আদিকাল থেকেই আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবেন। তিনি চিরঞ্জীব ও চির বিদ্যমান। তাঁর কোনই লয়-ক্ষয় নেই। নির্দিষ্ট করে তাঁর কোন স্থান বা জায়গা নেই। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর কোন উপমা, অংশীদার নেই। তাঁর কোন সমকক্ষ বা সমতুল্য কিছু নেই, তিনি সর্বত্র আছেন এবং সর্বক্ষণ বিদ্যমান । তিনি সবকিছু দেখেন, শুনেন। তিনি সকলের গোপনীয় কথা ও কাজ কর্ম এবং অন্ত রের সকল সংবাদ সম্পর্কে অবগত।

তাঁর সিফাত বা গুণসমূহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছে ঃ তাঁর সকল গুণসমূহ্ তাঁর সত্তার সাথে সংযুক্ত চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য। তিনিই একমাত্র মা'বুদ বা উপাস্য। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, হাযির, বাতেন, যাহের সর্ববিষয়ই তিনি পরিজ্ঞাত। তাঁর প্রত্যেকটি হুকুম-আহকাম, আদেশ-নিষেধ, বিনা দ্বিধায় অবশ্য পালনীয়।

মহান আল্লাহর কাজ সম্পর্কীয় জ্ঞান হচ্ছেঃ তিনি মাখলুকাতের সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব পালনকর্তা, সুমহান প্রভু। অর্থ-সম্পদ তাঁরই আয়ত্বের অধীন। শরীয়তের জ্ঞানও তিন ভাগে বিভক্ত। যথা-

আল্লাহ্‌র কিতাব, তাঁর রাসূলের সুন্নাত এবং ইজমায়ে উম্মাত। এগুলোর ব্যাখ্যা এ ক্ষুদ্র বইতে সংকুলান মোটেই সম্ভব নয়।

এখন মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে কিছু বর্ণনা উল্লেখ করা যাক! হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ সপ্ত আকাশের উপর আল্লাহ্ পাকের "মহা আরশ" সেই আরশের উপর আঠারো হাজার "বুরুজ" মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন। এবং প্রত্যেক বুরুজের উপর আঠারো হাজার "সত্তুন" দাঁড়া করেন এবং প্রত্যেক সত্তুনের উপর এক হাজার কংগর বানিয়ে এক কংগর হতে অপর কংগর পর্যন্ত ব্যবধান সাতশত বৎসরের রাস্তার সমান দূরত্ব রেখেছেন।

তৎপর প্রতিটি কংগরের উপর আঠারো হাজার "ফান্দীল" বানিয়েছেন। এবং প্রতি ফান্দীলের এমন পরিমিত যে, সাতটি আকাশ পাতাল এবং অনুষাঙ্গ সকল প্রকার বস্তু পদার্থ ও উদ্ভিদ প্রাণীগুলো সহ ঐ ফান্দীলগুলোর একটি ফান্দীলের উপর রাখা হলে- বিশাল মাঠে হাতের একটি আংটি রাখার মত মনে হবে। অর্থাৎ এই পার্থিব দুনিয়া, সাত আকাশ পাতাল একত্র করলেও প্রতি একটি ফান্দীলের তুলনায় কিছুই নয়। তাহলে ঐ আরশটির পরিধি কত বড়? ঐ মহা আরশের তুলনায় সাত আকাশ-পাতাল যখন কিছুই নয়, তাহলে প্রথম আকশের নিচে এই পৃথিবীর মূল্য কতটুকু ?

অন্তরাত্মায় ইবাদত করবার নিয়ম

মহান আল্লাহর প্রেম, মহব্বত ও ভয়ে সকল নামাজ ও যিকির আদায়ের বিষয়ে অন্তরাত্মায় অর্থাৎ- প্রত্যেক লতীফায় গভীরভাবে গবেষনা, সাধনা ও চিন্ত-চেতনা নিয়ে স্থানগুলোতে খুব মনোযোগ সহকারে ইবাদত করতে হয়। অন্যথায়, ইবাদতের কোনই ভাল ফল পাওয়া যাবে না। নিম্নে পর্যায়ক্রমে লতীফাগুলোর অন্তরাত্মা সহকারে আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি নিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে নিগূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করা হচ্ছে।

১. লতীফা নফ্‌স ঃ এ লতীফ নাভীর নিম্ন ভাগে ক্ষদ্র অংশে তার স্থান। পৃথিবী, আগুন, পানি, বায়ু ও মাটিসহ সব এলাকা নিয়ে এ লতীফার সীমা। এ লতীফার এলাকায় নিজস্ব কোন "নূর" নেই। এ লতীফার সীমাকে লতীফা ক্বলবের "নূরে" আলোকিত করতে হয়। ইহার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে। ইনশাল্লাহ্।

২. লতীফায়ে ক্বাল্‌ব ঃ এই লতীফা ক্বালব হতেই সকল ইবাদত শুরু করতে হয়। লতীফায়ে ক্বালব- তাজাল্লিয়াতে আফয়া'ল অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি বা ক্রিয়াকলাপের "নূর"। এ নূর শরিষা ফুলের বর্ণের মত, ইহা ক্বালবের অন্তর চোখ হতে প্রত্যেক নামাজেই আল্লাহর মহব্বতে ধ্যানে সাত আসমান ভ্রমণ করে বেলায়েতে ছোগরার শেষ সীমায় পৌছতে হয়-যা ক্বালবের শেষ সীমা। অর্থাৎ-ইহার শেষ সীমা আরশের অবস্থানে নফসে মোৎমাইন্যা পর্যন্ত। এ "নূর" আল্লাহ ভেদের মহা সমুদ্র। ইহা লতীফা ক্বালবের সহিত সম্পর্ক। বাম দুধের দু'অঙ্গুলীর নিচে লতীফা ক্বালবের এ স্থানেই অন্তর চক্ষু খুলে আল্লাহকে উপস্থিত জেনে মনে সংযোগ দিয়ে, নামাজ বা যিকির শুরু করতে হয়। এবং সূরা তস্‌বীহ্ দোয়া, এস্তেগফার, রুকু, সেজদা, তাশাহুদ ও

দরুদসহ উন্মুক্ত চোখে মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি নিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে এই ক্বালবেই সব পাঠ করতে হয়। এবং ক্বালবে ঐ নূরসমূহ আয়ত্ব করে ঐ নূরেই নিজকে চিনি পানির একত্রের মিলনের মত নিজকে আল্লাহর প্রতি বিলীন করতে হয়।

মহান আল্লাহর এ নূর ক্বালবে পরিপূর্ণ আয়ত্ব হলে ঐ নূরেই ক্বালব ও নফসের একত্রে সাধনায়, "নফসের" সীমাকেও আয়ত্ব করে নিজকে আল্লাহর জন্য বিলুপ্ত করতে হয়। বান্দার অস্তিত্ব এখানে ধ্যানে হারিয়ে তন্ময় ঘটে। তাই মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا

উচ্চারণ ঃ "মুতু ক্বাবলা আন্ তামুতু।"

অর্থাৎ (ইবাদতে আল্লাহর মহব্বতে এমন ভাবে ধ্যান-মন ঠিক কর যেন) "মরবার আগেই তোমরা ধ্যানে মরে যাও।" অতঃপর লতীফা রুহে নামাজ আদায় শুরু করতে হয়।

এখানে আরো হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ *

অর্থাৎ মহান আল্লাহ! আকাশ-পাতালের "নূর"-(এবং সেই) নূরের উপরেও নূর। (সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াত)

তাই খেয়াল করতে হবে যে, লতীফা ক্বালবের নূরের সীমার উপরে আল্লাহ্ পাকের সেই "নূর" লতীফা এ রুহের সীমায় বিরাজমান রয়েছে।

৩. লতীফায়ে রুহ্ ঃ লতীফা ক্বালবের ধ্যানে সাধনায়, নামাজ আদায়ের পর, এখন লতীফ "রুহে" নামাজ শুরু করার নিয়ম বর্ণিত হচ্ছে।

প্রত্যেক ইবাদত বা নামজে শুরুতেই আল্লাহ্ পাকের ও মহা রাসুলের বানী স্মরণ করা উচিৎ। যেমন–মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

উচ্চারণ ঃ "আলাম ইয়া'লাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা।"

অর্থ ঃ "সে কি জানে না ? যে, (তার ইবাদত বা নামাজ) আল্লাহ্ তাকে দেখেন?

আর রাসুল করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

উচ্চারণ ঃ আন্ তা' বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ফাইন্ লাম তাকু তারাহু ফাইন্নাহু ইয়া'রাকা।

অর্থাৎ (আল্লাহ পাককে ভালবাসতে হলে) "এমনভাবে ইবাদত বা নামাজ আদায় কর যেন, তুমি মহান আল্লাহকে দেখতেছ, (যা-আধ্যাত্মিকতার, অন্তরাত্মার চোখের সহিত সম্পর্ক) আর তা-না হলে ভাব বা সাধনা কর যে, মহান আল্লাহ্ তোমাকে দেখতেছেন।" (বুখারী, মুসলিম)

তবেই ইবাদত বা নামাজ কবুল হবে এবং মহান আল্লাহর প্রতি ভক্তি প্রেম মহব্বত স্থাপিত হবে। অন্যথায় নয়।

ডান দুধের দু'আঙ্গুলীর নিচে এই লতীফা "রুহের" স্থান। লতীফা "রূহ" "তাজাল্লিয়াতে সিফাত" ইহা বেলায়েতে ছোগরা অর্থাৎ সাত আসমান হতে শুরু হয়ে উপরে দিকে মাকামে "আকরাবিয়াত" যা আল্লাহ্র প্রেমের হেরেম বা বেলায়েতে "কোবরার" শেষ সীমা। ইহার শেষ প্রান্তে "কা'বা কাউসাইনের" অবস্থান। ইহা একটি বিশাল "নূরময়" জগৎ। এ "নূর" লাল ও সোনালী বর্ণের মত। সাত আসমান হতে বহুত উপরে দিকে। ইহার সীমা ক্বালবের সীমা হতেও অনেক বড় এবং বহু উপরে।

ইহাতেই আল্লাহর ছিফাতী আটটি নাম বিরাজমান, পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে যথাঃ হায়াত, এলেম, কুদরত, এরাদত, সামায়াত, বাছারাত কালাম ও তাক্বীন। আল্লাহ্ পাকের এই ছিফতী নামের নূরের ঝলকেই ডুবন্ত হয়ে বান্দার আল্লাহ্র সহিত মিলন হয়েই, বান্দার নিজ অস্থিত্ব হারিয়ে আল্লাহতে বান্দা বিলুপ্ত হয়। এবং আল্লাহ্তেই বান্দা মিশে যায়। ইহা লতীফা রুহের মূলের মূল স্থানের শেষ সীমা নফসে মোলহেমার স্থান। এখান থেকেই বান্দার প্রতি স্বপ্নে এলহাম হয়। রাসুলে করিম (সাঃ) তাই বলেছেন ঃ "খাঁটি বান্দার স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ছয় চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মর্যাদার সমান।" (বুখারী ও মুসলীম শরীফ)

যার এখানেই নফস মোহাদ্দেছার ও স্থান। লতীফা রুহের অন্তর চোখের এই রুপে ধ্যান-মনের শক্তি সাধনায় নামাজ বা যে কোন ইবাদাত সম্পূর্ণভাবে আদায় ও আল্লাহ পাকের "মহানূর" আয়ত্ব হবার পর এখন লতীফা সেরে ইবাদত বা নামাজ শুরু করবার নিয়ম বর্ণিত হচ্ছে ঃ

অতঃপর লতীফা নফস ক্বালব ও রূহের একত্রে ঐ মহানূরের মধ্যেই ডুবন্ত হয়ে আল্লাহ্ পাককে তালাশ করতে থাকলে তখন ঐ "মহানূরের" ঝলকে 'বান্দা' আল্লাহর অসীম কুদরতের চেহারা দেখতে পায়। তাই মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ " ফা' আইনামা তুয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ।" অর্থঃ "আল্লাহ পাক বলেন ঃ হে আমার বান্দা! তোমার মুখখানা এখন যেদিকেই ফিরাও না কেন? সেদিকেই আমার কুদরতের চেহারা দেখতে পাবে।"

৪. লতীফা সের ঃ লতীফা "রূহে" আল্লাহ পাকের নূরময় জগৎ উপলব্ধি করার পর লতীফা "এই সেরে" আন্তরাত্মায় অন্তর চক্ষু উন্মোচন করে পূর্বের ন্যায় আল্লাহর প্রতি ভক্তি সহকারে নামাজ বা যে কোন ইবাদত শুরু করতে হয়।

বুকের বা সীনার নিম্নে বাম পার্শ্বে এই লতীফা "সেরের" স্থান। লতীফায়ে সেরে রয়েছে, "তাজাল্লিয়াতে জাত" অর্থাৎ– আল্লাহ মহানের নিজস্ব হাকীকি "মহানূরময় জগৎ"। এ"নূরময়" জগতটি পূর্ব বর্ণিত নূরময় জগৎ হতে বহু উন্ধে-সীমাও পূর্ব বর্ণিত জগত হতে আরো বহুত বড়। "নূরময়" এই মহা জগতটি এই লতীফা সেরের সহিত সম্পর্ক।

এখানে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে তিনটি দায়েরা ঘাঁটি আছে, যথাঃ কামালিয়াতে নবুওয়্যাত, কামালিয়াতে রিসালত, কামালিয়াতে উলুল আজম এবং ইহাই কামলিয়াতে বেলায়াত।

অতঃপর পর্যায়ক্রমে উপরের দিকে আরো চারটি দায়েরা ঘাঁটি রয়েছে যথা ঃ হাকীকত কুরআন, হাকীকতে কা'বা, হাকীকতে ছালাত, ও মা'বুদিয়াতে ছিরফা, ইহাই হাকীকতে ইলাহিয়া। ইহা পূর্ব বর্ণিত সব দায়েরার উপরের স্থান। এখানেই মহানবী (সাঃ) এর মে'রাজ হয়েছে। মো'মেন বান্দাদের ও নামাজ ও-যিকিরে এ স্থানে মে'রাজ হয়। যেমন ঃ মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ "ইন্নাছ্ ছালাতা মে'রাজুল মু'মিনিনা।"

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই "নামাজ" মো'মেন বান্দাদের জন্য মে'রাজ।" উপরোক্ত দায়েরাগুলো হতে আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব হাকীকি ঐ মহানূরসমূহের কারেন্ট এসে এই লতীফায়ে সেরে পতিত হয়।

৫. **লতীফা খফী ঃ** যে কোন ইবদতে বা নামাজে লতীফা সের আয়ত্ব হবার পর লতীফা খফীতে ধ্যানে পূর্বের ন্যায় নামাজ বা ইবাদত শুরু করাতে হয়। এখন লতীফায়ে খফীতে ইবাদত বা নামাজের আরাধনা বা উপাসনার আলোচনা শুরু করা হলো।

কপালের মাঝে সেলবিয়াতে লতীফা খফীর স্থান। লতীফায়ে খফীর জগৎ উপরোল্লেখিত লতীফার জগতের সীমা হতেও আরো বহুত উর্ধ্বে এবং আরো অনেক বড় জগৎ এটা। এ লতীফায় মহান আল্লাহর "নূরের বর্ণ" আকীক পাথরের মত কালো। এখানেও চারটি দায়েরা (ঘাঁটি) আছে। যথা ঃ হাকীকতে ইব্রাহীম, হাকীকতে মুহব্বী, হাকীকতে মোহাম্মদী ও হাকীকতে আহম্মদী। এই ঘাঁটিগুলো পরস্পর উর্ধ্বমূখী।

লতীফা খফীর দায়েরা বা ঘাঁটিগুলোতে অন্তরাত্মা উন্মোচন করে ধ্যানে গভীর খিয়ালে নামাজ বা যে কোন ইবাদত আদায় করলে, উল্লেখিত দায়েরাগুলো হতে কালো বর্ণের নূরের কারেন্ট এসে লতীফা খফী সহ সারা দেহকে ডুবিয়ে নেয়। এবং পূর্ব লতীফাসমূহের ঐ মহা নূরের একত্রে নামাজী বান্দার অবস্থা ঐ মহা নূরে মিশে পূর্বের ন্যায় হতেও অধিকতর নিজ অস্তি ত্বকে হারিয়ে তন্ময় হয়ে, "প্রেমময় আল্লাহতে" চিনি-পানির মত মিশে বান্দা বিলিন হয়ে যায়। বান্দা তখন অফুরন্ত মহাশান্তি লাভ করে। এইভাবে লতীফা খফীর সাধনায় নামাজ বা যে কোন ইবদত প্রকৃতভাবে আদায় হলে পরে লতীফা "আখফায়' আরো অধিকতর গবেষনায় নামাজ বা ইবদত আরম্ভ করতে হবে। এবং প্রত্যেক ইবাদত নামাজ-যিকিরের নিয়মও ইহাই। এখন নিম্নে লতীফা আখফার ইবাদত নামাজ পড়ার নিয়ম বর্ণিত হলো।

৬. **লতীফায়ে আখফা ঃ** পূর্ব লতীফাগুলোর ঐ মহা নূরময় জগৎগুলোর "নূর" একত্র রেখেই সমন্বয়ে আখফার অন্তর চক্ষু খুলে নিয়ে আখফাতে ইবাদত বা নামাজ আদায় করতে হয়।

মাথার তালুর দুগদুগীতে লতীফা আখফার স্থান। লতীফায়ে আখফার সীমা খফী জগৎ হতেও অনেক উর্দ্ধে এবং বহুত বড় ইহা মাথার তালু হতে

শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে লতীফা আখফার "নূর" সবুজ বর্ণের। এ লতীফা আখফাকে তিনটি দায়েরা (ঘাটি) পর্যায়ক্রমে বহু উপরের দিকে যেমন হুবেব হেরফা তার বহু উপরে তাইনে আওয়াল তৎপর আরো বহু উপরে "লাতাইন"।

মানবাত্মার চেতনা ও দৃষ্টিশক্তি "আল্লাহর" মহাদান

দেহে যে কোন প্রাণীর প্রাণ না থাকলে সে দেহ যেমন "মৃত্যু"। তেমনি হাদীস ও কুরআনের বাহ্যিক দিক উচ্চারণ ও অর্থ হলো ঃ হাদিস এবং কুরআন কারিমর তার অঙ্গ বা দেহ। আর তার অন্তর নিহিত ব্যাখ্যায়, গবেষনা-সাধনায়, জ্ঞানে, চিন্তা-চেতনায়, যা বিশুদ্ধভাবে আত্মায় উন্মেষ ঘটে উহাই হাদিস কুরআনের তার জ্ঞানের আন্তরিক দিক বা প্রাণ। এভাবে হাদিস ও কুরআনের আলোকে যেমন পূর্বোক্ত বর্ণনায় মহান আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তিতে তাঁকে চিনবার-জানবার এবং তাঁর সহিত মিলিত হবার জন্য ছয় লতীফার অন্তরাত্মায় যে চিন্তা চেতনা আমরা পেলাম, উহাই হাদিস ও কুরআনের আন্তরিক দিক বা সকল ইবাদতের প্রাণ"।

হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ *

উচ্চারণ ঃ "কুনতু কান্‌জান্‌ মাখ্‌ফীয়ান্‌ ফা আহ্‌বাবতু আন্‌ "উরাফা ফাখালাক্‌তুল্‌ খালফা লি "উরাফা।"

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমি গুপ্ত ধন ভান্ডার রূপে বিদ্যমান ছিলাম। (মানব জাতির নিকট) আমার পরিচিত হতে বাসনা জাগ্রত হলো। তাই আমি জগতকে সৃষ্টি করলাম। এবং বিশ্ব মাঝে নিজের পরিচয়ের উদ্দেশ্যে যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে মানবজাতিকে সৃষ্টি করলাম।"

অতএব মানবআত্মায় ছয় লতীফায়, মানবকে মহান আল্লাহ্ তাঁকে চিনবার জানবার, উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্যই যোগ্যতা হিসেবে দান করেছেন। এবং ঐ ছয় লতীফার সহিত আল্লাহর নূর,– নূরের উপর মহানূরের মহা সাগরগুলো সম্পর্কেও বলে দিয়েছেন। যেন প্রেমময় মহান আল্লাহকে প্রেম মহব্বতে ভয়-ভক্তিতে (মানবগণ) ভালভাবে চিনে, তাঁকে জেনে নিতে পারে।

মানবদেহ অন্ধকার ঘর, ব্যাটারীর কারেন্ট হলো, মানবাত্মার ছয় লতীফা। যার আত্মায় আল্লাহ্‌র নূরে বাতি জ্বলে না, সে তো অন্ধকার ঘরেই বাস করে। তার আবার ইবদত নামাজ ও যিকির করবার দরকার কি?

সেই মহানূর সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহু নূরস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি - নূরুন্ আ'লা নূরিন।"

অর্থ ঃ "মাহান আল্লাহ"! আকাশ পাতালের "মহানূর" । সেই নূরেরও উপরে আরো বহু নূর।" (সূরা নূর ঃ ৩৫)

এ মহানূরসমূহের বিবরণ মহানবী (সাঃ)ও এভাবে বলেছেন ঃ

اَنَا مِنْ نُوْرِ اللّٰهِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ مِنْ نُوْرِىْ

উচ্চারণ ঃ "আনা মিন্ নূরিল্লাহি ওয়াল্ খাল্কু কুল্লুহিম্ মিন্ নূরী।" বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের (সাঃ) রাসুলে করিম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ওহে আল্লাহ্ পাকের রাসূল (সাঃ)!

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ কি সৃষ্টি করেছেন? তদুত্তরে দয়াল নবী উপরের হাদিসটি বললেন ঃ অর্থ "আমি আল্লাহ্র নূর হতে সৃষ্ট এবং আমার ঐ নূর হতেই মহান আল্লাহ্ সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন।"

অতঃপর সেই নূরকে চার ভাগ করতে ঃ প্রথম ভাগে মহান আল্লাহ "কলম", দ্বিতীয় ভাগে"লওহ" তৃতীয় ভাগে মহা "আ'রশ" বানিয়েছেন। চতুর্থ ভাগে আ'রশের ফেরেশতাদের, কুরসী, আবশিষ্ট্যাংশে সমস্ত ফেরেশতা মন্ডলীকে বানাইছেন। অতঃপর সাত আসমান, সাত স্তবক জমিন, বেহেশত দোজখ, ঈমানদারদের দৃষ্টি শক্তি, ছুর লতীফার উক্ত নূরসমূহ, এবং লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ্ তৌহিদের নূরসমূহ সৃষ্টি করলেন।

তাহলে বুঝা গেল যে, মহা রাসূল (সাঃ) ঐ মহা নূর হতেই সৃষ্ট, আর সমগ্র জগতও তাঁর ঐ নূর হতেই সৃষ্টি হয়েছে। এবং মহানবীর সৃষ্টিতেই পুলকিত হয় বিশ্ব জগৎ, পুলকিত হয় গাছপালা, পশু-পাখী, আসমান-জমিন, এবং সকল ফেরেশতা মন্ডলী।

অতএব, ইহা কারো নিকট অবিশ্বাস হলেও অবশ্যই সত্য যে, ছয় লতীফার ঐ নূরসমূহ প্রত্যেক ইবাদতের মাধ্যম ছাড়া প্রেমিক বান্দা প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র সহিত, প্রেমবন্ধন ও আল্লাহকে আয়ত্ব করা অসম্ভব। তাই প্রত্যেক ইবাদতে অন্তরাত্মায় ঐ ছয় লতীফায় ঐ মহা নূরের ঝলক, বান্দার ঈমানী বারুদে ইবাদতে জ্বলে উঠলে, আল্লাহর প্রেমিক বান্দা অবশ্যাই নিজ

আত্মিত্বকে বিলীন করে আল্লাহতে মিশে যাবেই। আর বান্দার জন্য ইবাদতের মুখ্য উদ্দেশ্য ইহাই।

ইবাদতে বান্দার অন্তরাত্মায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হলে, তখন মহান আল্লাহ্ যে বান্দার সাথেই সব সময় থাকেন। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ •

উচ্চারণ ঃ "ওয়া হুয়া মা" কুম আইনামা কুনতুম।" (সূরা হাদীদ, প্রথম রুকু)

অর্থ ঃ "তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ পাক (কল্যাণের জন্য) তোমাদের সাথেই থাকেন।" তাই বলে –মনের পরিস্থিতি ঐ রকম না হলে, তার সহিত তার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্ যে তার সঙ্গি হবেন, তা নয়, সুতরাং, বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্র ঐ কল্যাণের দৃষ্ট তখনই হয়, যখন বান্দাও ইবাদতে আল্লাহতে মিশে বিলুপ্ত হয়। আর বান্দাও তখন সর্বক্ষণ (জীবনে) মহান আল্লাহকে মনে স্মরনে রেখেই জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। সে জন্য আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

উচ্চারণ ঃ " আকিমিছ্ ছালাতা লি-যিক্রি।" অর্থ ঃ আমাকে (সর্বক্ষণ স্মরনের জন্য) তুমি আমার সহিত মহব্বতে মিশে যেতে পার এমনই ভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা কর। (সূরা ত্বহা ঃ ১৪)

এতে বুঝা গেল যে, বান্দার যে ইবাদত-যিকিরে, আল্লাহতে মিলনে সম্ভব হয় না, তার পক্ষে সর্বক্ষণ আল্লাহ্র প্রতি এমন স্মরণ অভ্যাস সম্ভব নয়, সে জন্যই সে সারা জীবন ইবাদত করলেও অসৎ কর্ম করতেই থাকে।

সুতরাং অন্তরাত্মার চক্ষু মেলে নিয়ে গভীর ধ্যান সাধনায়, প্রেমাস্পদ মহান আল্লাহ্ এক নামাজে-যিকিরে তালাশ করতে যেভাবে শিক্ষার প্রয়োজন, অন্তরাত্মায়-ইবাদত করবার নিয়ম পাঠে পূর্বে তাই ঐরূপে উল্লেখিত হয়েছে। আর এমনভাবে ইবাদত করবার জন্যই আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে বলেছেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

উচ্চারণ ঃ "ওমা খালাকতুল্ জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়াবুদুন।"

অর্থ ঃ "এবং আমি আমার ইবাদত করবার জনাই জিন ও মানব জাতিকে (যাবতীয় যোগ্যতা দিয়ে) সৃষ্টি করেছি।" (সূরা জারিয়াত ঃ ৫৬)

আল্লাহ পাক অন্যত্র বলেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِىْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ •

উচ্চারণ ঃ " লাকাদ্ খালাক্নাল্ ইন্সানা ফী আহ্সানি তাক্বীম্।"

অর্থাৎ ছয় লতীফার বিবরণে যে বিষয়বস্তু বলা হয়েছে, "তা সহ যাবতীয় যোগ্যতা দান করেই তৎসহ মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা তীন ঃ ৪ আয়াত)

সুতরাং মানবদের মত অনুপম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তাদের জ্ঞান সাধনা, বিবেক-বুদ্ধিও এমন গুণাবলীর সহিত অন্য আর কোন জীবের বা জগতের কোন তুলনাই হতে পারে না।

অন্য আর এক সূরাতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ •

উচ্চারণ ঃ সানুরীহিম আ'ইয়াতিনা ফীল আফাকে ওয়া ফী আন্ ফুসিহিম্ হাত্তা ইয়াতা বাইয়্যানা লাহুম্ আন্নাহুল্ হাক্কু।

অর্থ ঃ "আমি তাদেরকে (মানুষদেরকে) বাহ্যিক জগতে এবং তাদের (মানুষদের) দেহ ও আত্মার মধ্যে আমার (ক্ষমতার) নিদর্শনসমূহ দেখা দিয়ে থাকি, যার ফলে সত্যের গূঢ়তত্ত্ব তাদের (মানুষদের নিকট) প্রকাশিত হয়ে যায়।" (সূরা হামীম রুকু ঃ ৬)

এই আয়াতে জানা যায় যে, মহান আল্লাহ মানবজাতিকে ইবাদতের জন্য উচিৎ কর্তব্য পালন জ্ঞান বুঝানোর জন্যই, ঐরূপ অত্যন্ত সুন্দর সুগঠন ও সুকৌশলে বাহ্যিক জগতের তুলনা করেই যে শুধু মানব দেহকেই সৃষ্টি করেছেন তাই নয়, এই মানব জাতিকে বৃহত্তম জগৎ ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হিসেবেও এ জন্যেই গৌরবান্বিত করেছেন যে, মানব দেহাভ্যন্তরে বিশাল এক জগৎ "আত্মা, যিনি দেহ রাজ্যের অতি প্রবল প্রতাবশালী বাদ্শাহ হিসেবেও নিযুক্ত রয়েছেন।

হাদিস কুদসীতে মহান আল্লাহ রাসূল (সাঃ) কে বলেছেন ঃ ভূমন্ডল এবং সমগ্র আকাশ মন্ডল কোথাও আমার সংকুলান হয় না, কিন্তু আমার মু'মিন বান্দার "আত্মায়" আমার স্থান হয়। ইবাদতে (সাধক) বান্দা মিশে

এতখানি উন্নতি লাভে বান্দা যে শান্তি লাভ করে ইহাই আল্লাহর দর্শন বান্দার পরম শান্তি বান্দার জন্য অনুপম সুখ। ফলে, এ সাধক (বান্দা) বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। আর ইহার অন্যথায় হলে দোজখ। যেমন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ "ছুম্মা রাদাদ্‌নাহু আসফালা সাফিলিন।"

অর্থ ঃ "তৎপর আমি তাকে (ঐ মানুষকে) নিকৃষ্ট হতেও নিকৃষ্টতর করিব।" (সূরাতী ঃ ৫ আয়াত)

অর্থাৎ বান্দা (সাধক) যদি এমনভাবে ইবাদতে অবহেলিত বা অবিশ্বাসী হয় এবং প্রকৃতভাবে আমাকে চিনে নিতে আমার প্রদত্ত যোগ্যতাহারা হয়। তাহলে পশুরা তো দোজখে যাবে না তারা মৃত হয়ে হাশরের মাঠেতামা হয়ে থাকবে। আর এ নরাধমরা পশূদের চেয়েও নিকৃষ্টতর কীটে পরিণত হয়ে দুনিয়ার এ আগুন হতে সত্তর গুণ ত্যাজ তেজস্ব মহা জ্বালাময় দোজখে পতিত হবে।

পাপীদের শাস্তির জন্য মহান আল্লাহ বলেন ঃ "তাদের জন্য নিশ্চয়ই দোজখ প্রতীক্ষায় আছে। অবাধ্যদের প্রত্যাবর্তনের জন্য। তথায় তারা স্নিগ্ধতা পানীয় আস্বাদন করবে না।

উত্তপ্ত পানী ও পুজঁ ব্যতীত। সমুচিত প্রতিফল। নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশের আশা করে না। এবং তারা আমার নিদর্শনসমূহে অসত্যভাবে অসত্যারোপ করে। এবং উহাদের প্রত্যেক বিষয় লিখিতভাবে গননা করে রেখেছি। অতএব, ফলভোগ কর, ফলত শাস্তি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য আর কিছু বৃদ্ধি করবো না। (সূরা নবা আয়াত ঃ ২১-৩০)

ছয় লতীফার কিছু তত্ত্বাদি ও তথ্যসমূহের বিবরণ

আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ. وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .

উচ্চারণ ঃ "ওয়াসিয়া কুর্‌সিয়্যুহুস্‌সামা ওয়াতি ওয়াল্ আরদা-ওয়ালা ইয়া 'উ'দুহু হিফ্‌জু হুমা ওয়া হুওয়াল্ আ'লীউল্ আজীম।"

অর্থ ঃ "তাঁর (আল্লাহর) "আসন" আসমান ও জমিনে সর্বত্রই বিস্তৃত রয়েছে। এ দু'টির সংরক্ষণে রাখা তাঁর (আল্লাহর) পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। তিনি (আল্লাহ) মহান ও বিপুল প্রভাবশালী।"

এ আয়াতে আসমানের উপরের সীমা এবং জমিনের নিম্নসীমার পরিধি কত যে মহাব্যাপক বিস্তৃত এবং এ দুয়ের মাঝে বিশাল সংখ্যক তত্ত্বাদি ও তথ্য সমূহ যে রয়েছে তা স্বয়ং মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেও না- জানতে কেউ পারেও না। তবে ছয়টি লতীফার নূরময় জগৎসমূহ ঐ দুয়ের সীমার মাঝেই অর্থাৎ মহা আকাশ ও মহা পাতালসমূহ হলোঃ বাহ্যিক বিশ্ব দেহ স্বরূপ, আর তার অন্তর্নিহিত ছয় লতীফার অন্তর দিকে তার প্রাণের দিক অবস্থান সংক্ষিপ্ত বিবরণে ছয় লতীফা পর সীমা নিয়ে তার পরিধির সামান্য কিছু মাত্রা হলেও সাধক বান্দা, আল্লাহ পাকের প্রতি মহব্বত ভক্তি নিয়ে ইবাদত করলে আল্লাহকে বুঝে হৃদয়ঙ্গম করতেই পারে। ইহা মহান আল্লাহ, ইবাদত মাধ্যমে সাধক বান্দাদের প্রদান করেই দিয়েছেন কোন সন্দেহ নেই। আবার পুনরাবৃত্তি হয় যে, লতীফা ক্বালবে শরিষা ফুল বর্ণে সাত আসমান ব্যাপী আল্লাহ পাকের এক মহা নূরের সাগর। তার উপরে অতিশয় বিশাল এলাকা নিয়ে লতীফা রূহের লাল ও সোনালী বর্ণের নূরের আরো এক দ্বিতীয় মহাসাগর তারও বহুত উপরে এবং বিশাল বড় সীমা নিয়ে লতীফা সেরের তীব্র সাদা বর্ণের মহা নূরের তৃতীয় আরো এ মহাসাগর বিদ্যমান পর্যায়ক্রমে উহা হতে আরো বহু উপরের দিকে বিশাল বিশাল সীমা নিয়ে লতীফা খফী ও লতীফা আখফার আকীক পাথরের কালো বর্ণে ও সবুজ বর্ণের চতুর্থ-পঞ্চম মহা নূরের মহা সাগর বিরাজ মান রয়েছে।

তাই পূর্বোক্ত আছে- আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ উচ্চারণ ঃ "নূরুন আ'লা নূরিন।" অর্থ ঃ "নূরের উপরে মহা নূর।" (সূরা নূর ঃ ৩৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ, মানবজাতিকে তাঁর এই মহা বিশ্বের মাঝে এরূপেই নূর দ্বারা নূরময় করে তাঁকে চিনবার জন্যই ব্যবস্থাপনা দিয়ে (মানবদের) সৃষ্টি করে বিশেষভাবে অবগত করে দিয়েছেন মানবদেরকে।

উল্লেখিত হয় যে, মহান আল্লাহ, আসমান ও পর্বতের উপর পবিত্র কুরআন অবতরণ করতে চাইছিলেন কিন্তু তারা তা অক্ষমতা স্বীকার করলো। কারণ, পবিত্র কুরআনে যত তত্ত্বাদি ও তথ্যসমূহ আছে এই মহা বিশ্বের

মাঝেও সমান হারে তা বিদ্যমান আছে আবার পবিত্র কুরআন ও বিশ্বের মাঝে যা-যা, আছে তার নমুনা স্বরূপ সবই মানবদের মধ্যে প্রদান করে অতীব সুগঠনে ও সুকৌশলে মহান আল্লাহ্ এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, মানবজাতিই পবিত্র কুরআন অবতরণ গ্রহণ করত ঃ মেনে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আসমান ও পর্বতের মাঝে ঐ সব তত্বাদিও প্রদান করেছেন। তাই মানবগণ আল্লাহর পবিত্র গ্রন্থ আল্ কুরআন গ্রহন করে নেন। মানবজাতি আল্লাহ প্রদত্ব এতখানি ক্ষমতা পাওয়া সত্ত্বেও যদি ইবাদতে তা প্রয়োগ না করে তাহলে এ জাতির শাস্তি কি হতে পারে ? তা হৃদয়ঙ্গম করা উচিৎ কি না?

ইবাদতে ঐ মহা নূর আয়ত্ব করতে না পারলে মানবদেহ তো একটি অন্ধকারময় ঘর, বাতি হলোঃ তার আত্মা বা অন্তর, এটাতো কেউ অবিশ্বাস করবে না। কিন্তু যার "আত্মায়" ঐ মহা নূরের অংশ হতে বাতি জ্বলে না, সে তো ঐ, (অন্ধকার) ঘরেই বাস করে! ইহা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। বান্দাদের ছয় লতীফায় মহান আল্লাহ্ ইবদাতের মাধ্যমে যে, "নূরময়" জগৎ দেখা দেন, উহাই তো তাদের আত্মা বা অন্তরের বাতি। এই সত্যকে যারা বিশ্বাস পান না, তারা মানব শ্রেষ্ঠ মহা রাসূলের হাদিস ও কুরআনের ভাষায় হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্বন্ধে মহান আল্লাহ্ নিম্নলিখিত বাণীর তা কি জবাব দিবেন ? চিন্তা করে দেখুন! মহা নবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

زُوِيَتْ لِيَ الْأَرْضُ فَأُرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا*

উচ্চারণ ঃ "রুবিয়াত লিয়াল্ আর্‌দা ফাউরীত্ মাশারিকাহা ওয়া মাগারিবাহা।" অর্থ ঃ "মহান আল্লাহর পক্ষ হতে সমস্ত বিশ্ব জগতকে আমার সম্মুখে পেশ করেছেন- তখন আমি উহার পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তই প্রত্যাক্ষ করেছি।" এ হাদিসে লক্ষ্যণীয় যে, মহানবী (সাঃ) এর অন্ত রস্থ ঐ ছয় লতীফা না থাকলে অথবা উহাতে "নূরময়" জগৎ দেখবার ব্যবস্থাপনা না থাকলে মহান রাসুল (সাঃ) ঐ জগৎসমূহ কেমন করে প্রত্যাক্ষ করলেন? এবং মহান আল্লাহও বলেছেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ نُرِىٓ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

উচ্চারণ ঃ "ওয়া কাযালিকা নূরী ইব্রাহীমা মালাকুতাস্ সামা ওয়াতে ওয়াল আর্‌দি।" অর্থ ঃ "এই রূপে আমি ইব্রাহীম (আঃ) কে আসমানসমূহ এবং জমিনের সমস্ত রাজ্য দেখিয়েছি।" (সূরা আন্‌আম ঃ রুকু-৯)

তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)ও যেমন করে ঐ জগৎসমূহ দেখলেন ও বুঝলেন! ভাবুন-তো! পূর্বোক্ত হয়েছে যে-দেহে প্রাণ না থাকলে কোন প্রাণীই বাঁচে না তা মৃত্যু। আসমানী সব গ্রন্থই আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক জগন বিজ্ঞানের বাহ্যিক দিক- দেহ স্বরূপ। কিন্তু তার প্রাণ হলোঃ ঐ মহা জ্ঞানের অন্তর নিঁহিত অন্তর (অভ্যন্তরীন) দিক। তা ছয় লতীফার অন্তঃস্থলেই অন্তর নিহিতের সাথেই সম্পর্ক হয়ে রয়েছে। আসমানী ঐ মহা গ্রন্থের জ্ঞানের আন্ত রিক জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ প্রেমিক বান্দারা প্রেমাস্পদ আল্লাহকে ইবাদত যিকিরের মাধ্যমে গভীর গবেষণা সাধনায় চিনে নিতেই পারেন। গ্রন্থের জ্ঞানের যে প্রাণ সে প্রাণময় জ্ঞানে ইবাদত যিকিরের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে চিনবার স্থান হলো ঃ আত্মা বা অন্তরের অভ্যন্তরিণ ছয় লতীফার তথ্যাদির প্লাট ফরমের সহিত সম্পর্কিত মহা নূর ময়ের কারেন্ট বা ব্যাটারী ছয় লতীফার ব্যাটারী, মহা নূরের কারেন্টের সহিত "প্রেমিক বান্দার" আল্লাহ্ পাকের প্রতি ছহিহভাবে ঈমানে বারুদ থাকলে, আবশ্যই মহা নূরের জ্বলন্ত আগ্নিকনা তার ছুয় লতীফায় জ্বলিয়ে উঠবেই। অতঃপর বান্দার দেহে ত্রিশ কোটি লোম, এবং বাহ্যিক বিশ্ব "দেহে" আগুন, পানি, বায়ু, মাটি, চন্দ্র, সূর্যগ্রহ তারা, আকাশ-পাতালের সবই এক একটা লতীফা, উহাতেও মহানূরের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ প্রেমিক বান্দা, প্রেমাস্পদ আল্লাহ্র প্রতি একাগ্রচিত্ত্বে মনোনিবেশে ভয়-ভক্তি, স্থাপন করে ইবাদতে কঠোরভাবে সাধনা করলে তাতে যদি ঈমানী বারুদ যথারীতি থাকে অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত্ব ঐ মহানূর জ্বলন্ত হয়ে সারা বিশ্বকে "নূরময়" হিসেবে দেখে "বান্দা" নিজকে তখন চিনে নেবে এবং নিজকে ঐ রূপে চিনতে পেরেই তিনি মহান আল্লাহকেও চিনে নেন। যেমন ঃ মহা রাসুল (সাঃ) বলেছেন ঃ ইহা পূর্বেও উল্লেখিত রয়েছে ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ*

অর্থাৎ "যে নিজেকে চিনে, সে-ই প্রভূ আল্লাহকে চিনে।"

সুতরাং বিশ্বাস করতেই হবে যে, মহান রাসুল (সাঃ) এর সমগ্র বিশ্ব দেখা, উহার পূর্ব ও পশ্চিম সীমা পর্যন্ত এবং হযরতে ইব্রাহীম (আঃ)এর আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত রাজ্য দেখাও, লতীফার মাধ্যমেই ঐ মহানূরের সমন্বয়েই হয়েছিল।

পরিশেষে লিখতে হয় যে, নাম জাহেরী ও লোক দেখানো ইবাদতকারী, নামাজীরা এবং বিশ্বের এমন বহু মানুষ আছে তারা এই ছয় লতীফার তত্ত্বাদি ও তথ্যসমূহ বিশ্বাস না করলে আল্লাহ্ প্রেমিকদের জন্য কিছুই যায় আসে না।

ইহা এই জন্যই যে, পবিত্র কুরআন-গ্রন্থ আল্লাহ্‌র মহাদান স্বরূপ ইহা সত্যই। তবে ইহা পবিত্র কুরআনের মহা মূল্যবান একটি বাহ্যিক দিক। আর আত্মা বা "অন্তরের" দিক হচ্ছে ঃ মহানবী (সাঃ) এর জীবন ব্যাপী আ'মালে অন্তরের অন্ত:স্থল যোগে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবৃয়ে তাবেঈন পরম্পরায় সিল্‌সিলায় পর্যায়ক্রমে সে পীর মাশাইখ। আল্লাহর ওলী-আবদাল সকল ইবাদত নামাজ ও যিকিরে আধ্যাত্মিকতা বা আন্তরিকতার আ'মালের নিয়ম যেভাবে অদ্যবধি চলে এসেছে তা কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ্ চলমান থাকবেই। মহা রাসুল (সাঃ) হতে ঐ চলমান আ'মালই আল কুরআনের অভ্যন্তরিণ বা আন্তরিক দিক। যা আল্লাহ্ পাকের প্রেম মহব্বতে খাঁটি ইবাদত। অতএব পরবর্তী যিকির পাঠে ইনশাআল্লাহ্ ইহার আরো বিবরণ দেয়া হবে মর্মে, এখন এ স্থলেই সংক্ষেপে ছয় লতীফার তত্ত্বাদি ও তথ্যসমূহের বিবরণ সমাপ্ত করা হলো।

রিয়াযত

মানুষ ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার ভেদ বা রহস্য

"রিয়াযত" অর্থ কঠোর সাধনা। আল্লাহ্ আ'লাকে চিনার ও জানার জন্য যে কঠিন সাধনা করা হয়, উহাই "রিয়াযত"। নামাজ ও যিকির আদায় করার সময় তা ভাবতে হবে। মানবদেহে দু'টি অবস্থা আছে ঃ একটি সূক্ষ বা লতীফাগুলো (নফস, ক্বালব, রূহ, সের, খফী ও আখফা)। আর অপরটি হলো ঃ স্থূল দেহ। (যাতে) আছে পাঁচটি লতীফা। যথাঃ আগুন, পানি, বায়ু, মাটি ও নফস।

আদি সৃষ্টির দিনে আ'লমে আমরে পাঁচটি লতীফাকে আল্লাহ্ পাক ছিফাতে হাকীকত্বে সৃষ্টির নিরাকার হাকীকতের প্রতি "কুন" আদেশ প্রয়োগ করেন। সেই "কুন" শব্দটাই আদেশ। এই আদেশের দ্বারা আল্লাহ্ পাক, ক্বালব, রূহ, সের, খফী ও আখফা লতীফাসহ "রূহ" সৃষ্টি করেছেন। এই জন্য ঐ পঞ্চ লতীফাকে আ'লমে আমরের লতীফা বলা হয়। আল্লাহ্ পাক "কুন" আদেশে "রূহকে" ঐ পাঁচটি লতীফা দিলেন। "রূহ" আলোকময়

জগতের উপাদান। আল্লাহ পাকের ছিফাতে এবাদত থেকে "রূহ" সৃষ্টি করেছেন। "রূহ" আল্লাহর গুণে গুণান্বিত। "রূহ" যাবতীয় সৎ গুণের আকর। মহান আল্লাহ "রূহ" কে অন্ধকার শরীরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলে তা মানব শরীরে প্রবেশ করেই বলল, প্রভু আমি আলোকময় হয়ে অন্ধকারে কেমন করে থাকি? পরে আদম (আঃ)-এর দেহে নূরে মুহাম্মদী প্রবেশ করার পর রূহ মানবদেহে প্রবেশ করলো।

নফ্স অন্ধকারে সৃষ্টি। যাবতীয় কুচিন্তা ও পাপাচারে সে লিপ্ত হয়েই নিজে তৃপ্তি পায়। সে মহান আল্লাহকে স্বীকার করতে নারাজ। এই জন্যেই নফসকে "ফেরআউন" বলা হয়। তাই নফসকে ভাল কাজে লিপ্ত ও বন্ধু বানাবার জন্য আল্লাহ্ তার মধ্যে "রূহ" প্রেরণ করেন। আর রূহের সহযোগী হিসেবে দিলেন, ক্বালব, সের, খফী ও আখফাকে।

ফলে "রূহ" তার সহযোগীদের নিয়ে "নফ্স" কে হেদায়েতকরণ দূরের কথা "রূহ্" নিজেই নফসের সৈন্যের কাছে বন্দী হলো। ফলে "রূহ" নানা পাপাচারে লিপ্ত হলো। অর্থাৎ "রূহ" নফসের দাসত্ব শুরু করলো। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ "কাল্লা বাল্ রাআনা আ'লা ক্বুলুবিহিম্ মা কানু ইয়াকসিবুন।"

অর্থাৎ-(আমার বাণী মিথ্যা) কখনোও নহে, কিন্তু স্বীয় অর্জিতে কর্মের দোষে তাদের ক্বালবের উপর মরিচা পড়েছে। (সূরা মুত্তাফিফীন ঃ ১৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ *

উচ্চারণ ঃ "আফারাআইতা মানিত্তাখাযা ইলাহাহু হাওয়াহু ওয়া আদাল্লাহুল্লাহু আ'লা ইলমিন।"

অর্থাৎ "আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখছেন, যে নিজের নফসকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে, আর আল্লাহ পাক তাকে জ্ঞান দেয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন।" সুতরাং নফসের দাসত্ব হতে বাঁচতে হলে প্রয়োজন, "রূহের" সহযোগীদের ক্বালব, সের, খফী ও আখফা নিয়ে কঠোর" রেয়াযত" বা সাধনা করা।

তহলে উক্ত লতীফাগুলোতে সরিষা ফুলের ন্যায় হলুদ বর্ণের "নূর" এসে মহাসমুদ্রে পরিণত হবে। সেই "নূর" ক্বালবের পর্দায় ভেসে উঠে, আরশ, কুরসী, লওহ, কলম, বেহেশত, দোজখ, আসমান ও জমিন আলোকিত হবে।

ফলে, সাধক যে দিকে তাকায় সেদিকেই মহান আল্লাহ্র কুদরতী "নূর" দেখতে পাবে। এই জন্যেই, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

উচ্চারণ ঃ "ফা আইনামা তুয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ।"

(সূরা বাকারা ১৪ রুকু)

অর্থ ঃ অতএব, বান্দা যে দিকেই মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহ্র কুদরতী চেহারা দেখতে পারবে। মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ*

উচ্চারণ ঃ "ওয়া ফী আন্ ফুসিকুম আফালা তুব্ছিরুনা।"

(সূরা জারিয়াত, প্রথম রুকু)

অর্থ ঃ "ওহে বান্দা! আমি ক্বালবে (সীনার) মধ্যেই আছি, তবে কি তোমরা আমাকে দেখ না"? এ বাণীগুলো, পূর্বেও উল্লেখিত আছে। ক্বালবের মূল হলো "আরশ"। মূলের মূল তাজাল্লিয়াতে আফয়া'ল, উহা বেলায়েতে ছোগরার "নূরময়' জগৎ। আর ক্বালবের শেষসীমা তাযাল্লিয়াতে আফআল্ পর্যন্তই ।

তবে রূহের গন্তব্য আরো উর্দ্ধে, ছিফাতে এরাদত পর্যন্ত। ছিফাতে এরাদত আকরাবিয়াতে অবহিত। ছিফাতে এরাদতই রূহের মূলের মূল। লতীফা ক্বালব যখন, রূহ, সের, খফী ও আখফার সাথে যুক্ত হয়, তখন বিশ্বময় নূরের বিশাল সাগর তৈরী হয়। এই জন্যই রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ*

উচ্চারণ ঃ "ক্বালবুল মু'মিনে আরশিল্লাহ।" অর্থ ঃ "মু'মিনের আত্মা বা আন্তর আল্লাহর সিংহাসন।" আর হাদিসে কুদসীতে মহান আল্লাহ এ কারণেরই বলেন, আমার স্থান মু'মিনের ক্বালব বা অন্তর ছাড়া আর কোথাও স্থান হয় না।

লতীফা রূহের সীমা লতীফা ক্বালবের চেয়েও অনেক বড়। ইহার সীমা হাকীকি ছিফাত পর্যন্ত। উক্ত নূরের প্রভাবে নাফসের পাপগুলো ঝরে পড়েই নফস পবিত্র হয়। আর নফস তখন আল্লাহমূখী হয়।

আবার লতীফা সেরের পরিধি রূহের পরিধির চেয়েও বিশাল। কারণ, সেরের মূল আল্লাহ পাকের শান ছিফাতসমূহের মূলের মূল। বক্ষস্থলে তখন বিশাল নূরের আলো আসতে থাকে। আবার লতীফা খফীর পরিধি সের লতীফার চেয়েও বিশাল। খফীর মূলের মূল ছিফাতে ছিলবিয়া। যা আল্লাহ পাকের মানদন্ড হিসেবে পরিচিতি।

সাধক এখানে পৌছলে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ পাকের কোন ক্ষয় বা লয় নেই। ইহা আল্লাহর জাতি নূরের মহাসমূদ্র। অতঃপর, লতীফা আখফার উচ্চতা আরোও উর্দ্ধে। আখফার মূলের মূল "তা-ইনে আওয়াল" এর গভীরে কেন্দ্র যা হুব্বে ছেরফা বলে পরিচিত। কোন সাধকের লতীফা আখফা পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হলে সাধক হুব্বে ছেরফা ও মা'বুদিয়াতে ছেরফা পর্যন্ত উরুজ করতঃ পরম করুণাময় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। উল্লেখিত পঞ্চ লতীফা ক্বালব, রূহ, সের, খফী ও আখফা মানুষের সীনার (বক্ষের) মধ্যেই অবস্থিত। সীনার মধ্যেই সাধক মহান আল্লাহকে পায়। আ'রশ, কুরসী, লওহ, কলম, বেহেশত, দোজখ সবই নিজের মধ্যে দেখতে পায়। তখন সাধক, আল্লাহর ভেদে পরিণত হয়। আল্লাহর ভেদ মানুষ, আর মানুষের ভেদ আল্লাহ্ পাক। ইহাই সাধকের "রিয়াযত" ও মানব সীনার প্রশস্থতা।

ইস্‌লাম ও মুসলমানের পরিচয়

নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মুস্ত হাব এবং রুকু, সেজদা করা, তসবীহ এস্তেগফার ও দোয়া, পবিত্র কুরআন পাঠ করা এগুলো হলোঃ ইসলামিক বাহ্যিক দিক। আর গভীর ধ্যানের সাথে, মহান আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তি, প্রেম-মহব্বতে, তাঁর দর্শন ও নৈকট্য লাভে দেহমন আত্মা বা অন্তর "নূর ময়" হওয়াই হলোঃ ইসলামিক অভ্যন্তরিণ, আধ্যাত্মিক বা আন্তরিক দিক।

মানবদেহে আল্লাহ পাকের দু'টি গুণের সমাবেশ আছে। আকারবিশিষ্ট যেমন ঃ দেহ (শরীর)। অপরটি নিরাকার যেমন ঃ শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি কথন (কথা) বা স্বাদ-মিষ্টি, ঝাল-টক, আত্মা, অন্তর বা প্রাণ এ লতীফাসমূহ আকার বিহীন (নিরাকার)। ঐ নিরাকার বস্তুর দ্বারা নিরাকার প্রভূ আল্লাহর সহিত

যখন "বান্দার" লোহা-আগুনের সাথে মিলন হয়, তখনই মানুষ আকারবিশিষ্ট এ মানবদেহ বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে, এ অবস্থায় তখন মানুষ আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ٭

উচ্চারণ ঃ "ছিবগাতাল্লাহি ওয়ামান্ আহ্‌সানু মিনাল্লাহি ছিবগাতান।"

অর্থাৎ (আমরা) "আল্লাহ্‌রই রংয়ে রঞ্জিত, আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতম রঞ্জনকারী।" (সূরা বাকারা ১৩৮ আয়াত)

এঅবস্থায় যখন মানুষ উন্নত হয় তখন ঃ মানুষ আল্লাহর ভেদ, আর আল্লাহ পাকও মানুষের ভেদে পরিণত হয়। কাজেই বলা যায়, মানবদেহ আল্লাহ পাকের ভেদের এক মহা সাগর। এ বইটির পূর্ব বর্ণিত নিয়মে ছয় লতীফার "মহানূরে" নিজ অস্তিত্বকে বিলিন করে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশে مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْ অর্থ ঃ "মরবার আগেই তোমরা মরে যাও।" এ হিসেবে আল্লাহর প্রেমে নিজেকে আল্লাহর ইবাদতে হারিয়ে যাওয়াই ইসলাম ও ইবাদতের মূল লক্ষ্য। যেমন ঃ পানিতে চিনি মিশলে চিনি-পানি, এক ও অভিন্ন হয় তখন যেমন ঃ চিনির অস্থিত্ব দেখা যায় না বা আগুনে পুরে লোহা লাল হয়ে এক ও অভিন্ন হয়, তখন লোহারও অস্তি হারিয়ে যায়, তেমনিভাবে তখন আল্লাহ্‌র "বান্দা" আল্লাহর নূরে বা রঞ্জন (বর্ণে) মিশে আল্লাহর সহিত এক ও অভিন্ন হয়।

তখন "বান্দাও" নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে সে নিজেকে তখন আর দেখে না। এটাই আল্লাহ পাকের সহিত বান্দার প্রেম-মহব্বত ভেদে পরিণত হওয়া। আর এ "ভেদ" ই হলো আল্লাহর প্রতি "বান্দার" আত্মসমর্পন। "বান্দার" ভেদে এ অবস্থায় উন্নত হবার নামই ইসলাম। আর ইসলামের এ অর্থেই "বান্দার" আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পন বা ভেদ। ইসলাম শব্দের অন্য অর্থ হলো ঃ "শান্তি" অর্থাৎ-মহান আল্লাহর প্রতি "বান্দার" এ মিলনে যে শান্তি হয়, ইহা সেই "ইসলাম"। ইবাদতে এই ইসলাম যারা গ্রহণ করত ঃ নিজেকে আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দেয় তারাই হলো প্রকৃত মুসলমান। আর এটাই হলোঃ "ইসলামের আন্তরিক দিক"।

যেমন ঃ মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন ঃ

وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

উচ্চারণ ঃ "ওয়ালা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আন্‌তুম্ মুস্‌লিমুন্"।

অর্থ ঃ "এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২ আয়াত)

ইহাই ইসলাম ও মুসলমানের স্বরূপ। আমাদের এই ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

মহান "আল্লাহর" সান্নিধ্য লাভের দু'টি পথের পরিচয়

মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য নিম্নোক্ত দু'টি পথের পরিচয় পূর্বোক্ত পাঠের আলোচনা হতেই উপলব্দি করে আসতে হবে। অর্থাৎ তাজাল্লিয়াতে আফ আ'লের "লতীফা ক্বালবের" সীমায় সপ্তম আকাশে আ'রশের নিকট নফসে মোৎমাঈন্ন পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টির ক্রিয়া-কলাপের সরিষা ফুল বা হলুদ বর্ণের মহানূর সমুদ্রের বিষয়। তৎপর জানা থাকতে হবে, তাজাল্লিয়াতে ছিফাতের বিষয়। যথাঃ লতীফা "রূহের" আকরাবিয়াত, কাউস, আল্লাহ পাকের হাকীকি ছিফাতের আট নাম। যেমন ঃ হায়াত, এলম, কুদরত, এরাদত, সামায়াত, বাছারত, কালাম ও তাকবীম। তৎপর নফসে মোলহেমা ও নফসে মোহাদ্দেছা। অতঃপর-তাজাল্লিয়াতে জাতের যথা ঃ লতীফা সেরের, যেমন ঃ কামালিয়াতে নবুওয়্যাত, কামালিয়াতে রিসালতে, কামালিয়াতে উলুল আজম, ইহাই কামালিয়াতে বেলায়াত। অতঃপর হাক্বীকতে কুরআন, হাক্বীকতে কা'বা, হাক্বীকতে ছালাত, পরে মা'বুদিয়াতে ছেরফা, ইহাই হাক্বীকতে ইলাহিয়া। এ খানেই মহানবী (সাঃ) এর মে'রাজ হয় এবং প্রিয় বান্দাদেরও মে'রাজের স্থান এখানেই। ইহার আরো উপরে লতীফা খফী যথা ঃ হাক্বীকতে ইব্রাহীম, হাকীকতে মূছবী, হাক্বীকতে মোহাম্মদী ও হাক্বীকতে আহম্মদী। তারও বহু উপরে লতীফায়ে আখফা যথা ঃ হুব্বে ছেরফা, তা-ইনে আওয়াল ও লাতাইন। এগুলো সবই পূর্বে বর্ণিত রয়েছে। যা সর্বমোট চব্বিশটি দায়েরা বা মহানূরের ঘাঁটি। ঐ "মহানুর" সমূহে বান্দার প্রতিটি ইবাদতে যখন বান্দার নিজ অস্তিত্বকে আল্লাহর মহব্বতে হারিয়ে ফেলে তখন বান্দাকে যোগ্য করে তুলে এবং বান্দাকে আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান করে।

প্রত্যেক ইবাদত মর্মে বান্দাকে এ বিষয়গুলো পূর্বেই জানতে হবে। আর মানবাত্মা এ পর্যায়ে উন্নত হলে "বান্দা ইবাদতে" আল্লাহর গুণে গুনান্বিত হয়। এ বিষয়টিই নিয়েই মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ * تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ উচ্চারণ ঃ "তাখাল্লাকু বি আখ্‌লা কিল্লাহ্।" অর্থাৎ "তোমরা আল্লাহর চরিত্রের নমুনায় নিজেদের চরিত্র গঠন কর।" এই আলোকে আল্লাহ্ পাকের গুণের যথা সাধ্য গুণান্বিত হওয়া প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

তাই লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ পাকের সহিত সান্নিধ্য লাভ করতে চাইলে, ইবাদতের মাধ্যমে বান্দার দু'টি পথের যে কোন একটি পথে অগ্রসর হতে হয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহু ইয়াজতাবী ইলাইহি মাঁইয়া শাই" ওয়া ইয়াহ্‌দী ইলাইহি মাঁই ইউনিব।" (সূরা শুরা ঃ ১৩ আয়াত)

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে (বান্দাকে) মনোনীত করেন। আর যে বান্দা তাঁর (আল্লাহ্‌র) দিকে গমনে ইচ্ছুক হয়, তাকেও তিনি পথ প্রদর্শন করেন।" এ আয়াতে দু'দলের পরিচয় মিলে। "একটি দল এজতেবা, অপরটি দল এনাবত।" তবে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে হলে এজাবতের পথে অগ্রসর হতে হবে, এনাবতের পথে নয়। তাহলে জানা প্রয়োজন এজতেবা ও এনাবত কি ?

প্রথম দল মনোনীত নির্বাচিত, ইহাই "এজাবত"। আর দ্বিতীয় দল যারা সেচ্ছায় আল্লাহ্‌র পরিচয় গ্রহণে আগ্রহী, ইহাই "এনাবত"। অর্থাৎ প্রথম দল যে পথে অগ্রসর হন, সেই পথের নাম "এজাবত" আর দ্বিতীয় দল যে পথে অগ্রসর হতে চান, উহাই "এনাবত"।

প্রথম পথ "এজাবত" তথা নিয়ে যাওয়া হয়। আর দ্বিতীয় পথ "এনাবত" তার নিজে নিজেই আগ্রসর হতে হয়। প্রথম পথে যারা অগ্রসর হন, তাদেরকে "মোরাদ" বলা হয়। আর দ্বিতীয় প্রথ যারা আগ্রসর হন, তাদেরকে "মুরীদ" বলা হয়। এই নিয়ে যাওয়া আর নিজে অগ্রসর হবার মধ্যে বিরাট পার্থক্য এজতেবার পথকে "নবুওয়্যাতের" পথ আর এ এজবতের পথকে "বেলায়েতের" পথ বলা হয়। এজতেবার পথে আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভ একটু সহজ। আর এনাবতের পথে একটু কঠিন।

এজাতেবার পথে সাধনা শুরু হয় "লতীফায়ে ক্বালব" হতে। আর এনাবতের পথ শুরু হয়, লতীফায়ে নাফস থেকে। কারণ, ইহাতে ভ্রমণ করতে হয় নাফস আম্মারা দমন করে, তৎপর লাওয়্যামা, অতঃপর নাফসে মোৎমাঈন্যা, তারপর নফসে মোলহেমো সব শেষে নফসে মোহাদ্দেছায় পৌছতে হয়।

পরবর্তি এই নফস দু'টোর অবস্থান হলো ঃ "লতীফায়ে রূহে।" এজতেবার পথ "লতীফায়ে ক্বালব" হতে বেলায়েতে ছোগরা অর্থাৎ সাত আসমান পর্যন্ত ত্বয় (ভ্রমন) করে নূরের তাজাল্লি (ঝলক বা চমক) সহজ কিন্তু এনাবতের পথ লতীফা নফস হতে বেলায়েতে ছোগরা পর্যন্ত নূরের তাজাল্লি (চমক) প্রকাশ কঠিন।

তবে এ পথে কঠিন সাধনায় অগ্রসর হতে থাকলে অবশেষে উক্ত দু' লতীফার (নাফস ও ক্বাল্‌ব) একত্রে নূরের তাজাল্লি প্রকাশ পায়। বেলায়েতে ছোগরার (ক্বালবের) মধ্যে সাত আসমানের ভিতর ছিফাতগুলো এ জাফিয়ার (ত্বয় করার) মাধ্যমে ছায়ের (ভ্রমণ) করতে বিদ্যুৎ চমকানোর মত তাজাল্লি (চমক নূরের বা ঝলক) আসতে থাকে। বান্দা (সাধক) উক্ত মহা নূরের মধ্যে ডুবে থাকা মনে করতে হবে।

তৎপর লতীফা রূহ হতে, লতীফা সের খফী ও আখফা লতীফায় ছায়ের (ভ্রমণ) করে বান্দার (সাধকের) নিজ অস্থিত্ব হারিয়ে আল্লাহতে মিশে, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে হয়। অতএব, গভীর মনোযোগের সহিত মান্নিধ্য লাভ করতে হয়। অতএব, গভীর মনোযোগের সহিত এ পাঠের বিষয়গুলোর সহিত মনোনিবেশ করতে পারলেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের দু'টি পথের পরিচয় ইনশা আল্লাহ সহজ হয়ে উঠবেই, যদিও বিষয়টি খুব কঠিন।

আল্লাহ্‌র প্রেমে উর্ধ্ব জগতের প্রতি ভ্রমণ

পূর্বেই লিখিত আছে যে, মহান আল্লাহকে চিনবার পথ চলা শুরু হয়, লতীফা ক্বালব থেকে শুরু হয়ে উল্লেখিত চল্লিশটি দায়েরা ঘাঁটিগুলো পর্যায়ক্রমে পার হয়ে ইবাদতের মাধ্যমে ক্বলবেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে হয়। ক্বালব বা অন্তরে দায়েরাগুলোর মাধ্যমে উর্দ্ব দিকে ভ্রমণের সময় একের পর একেক দায়েরা পার হতে হয়। যেমন ঃ ক্বালব থেকে উর্ধ্ব দায়েরা যথাক্রমে বেলায়েতে ছোগরা (সাত আসমান) ত্বয় (অতিক্রম) করে উপরে আকরাবিয়াত, হাক্কীকতে সিফাত, আল্লাহর আট নাম সহ নাফস মোলহেমায়

বেলায়েতে কোবরা, শরহে ছুদর সীনায়, অতঃপর কামালিয়াতের দায়েরাসমূহ হতে হাক্কীকতে ইলাহীয়া ও হুব্বে ছেরফা পর্যন্ত পৌছতে হয়। তবে উর্দ্ধ পথে ভ্রমণের সময় বেলায়েতে ছোগরার শেষ পর্যন্ত যে ভ্রমণ (অন্তরে ইবাদত) করা হয়, ইহাই আল্লাহর সান্নিধ্যের উদ্দ্যেশ্য ভ্রমণ। ইহার শেষ প্রান্তে এসে আল্লাহর হাক্কীকি ছিফাতের নামের প্রতিবিম্বের সহিত নিজেকে ফানা (অস্তিত্বহীন বা ধ্বংস) মনে করতে হয়। এতে সাধকের নিজস্ব অস্তিত্ব আল্লাহতে বিলুপ্ত হলেও প্রকৃত ফানা নয়। ইহাকে ফানায়ে ছুরত বলা হয়। আর ইহাই তরিকতের সীমা।

তবে প্রকৃত ফানা অর্থাৎ আল্লাহতে বান্দার (সাধকের) নিজ অস্তিত্ব (সম্পূর্ণভাবে) হারিয়ে যায়, আল্লাহময় জগতের ভ্রমণে বা ছায়ের ফিল্লাহতে। আর ইহা শুরু হয়, আকরাবিয়াত থেকে মা'বুদিয়াতে ছেরফা ও হুব্বে ছেরফা পর্যন্ত। আর ইহাই হলোঃ "হাক্কীকত"। আর ইহাই হলো ঃ আল্লাহময় জগৎ। প্রকৃতভাবে বান্দার নিজস্বকে এখানেই আল্লাহতে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে। আর ইহাই প্রকৃত ফানা বা ধ্বংস। ইহাই মা'রেফত, আল্লাহতে প্রকার হীন বান্দার সান্নিধ্য। তাই আল্লাহর বাণী, রাসুল (সাঃ) বলেন ঃ এই এখলাছ, আমার গূঢ় রহস্যসমূহের অন্যতম। যাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন, তাকেই এই নিগূঢ়তত্ত্ব দান করেন।

মানব সীনা (বক্ষ) নূরের মহাসমুদ্র

মানব সীনায় (বক্ষে) মহান আল্লাহর পাঁচটি নূরের মহাসমুদ্র আছে। ক্কালব, সরিষা ফুলের বর্ণ, রূহ, লাল ও সোনালী বর্ণ, সের তীব্র সাদা বর্ণের, খফী আকীক পাথরের ন্যায় কালো বর্ণের ও আখফা সবুজ বর্ণে মিলিত হয়ে, মানব সীনায় "নূরময়' মহা সাগর সৃষ্টি হয়।

সাধক বান্দা, ইবাদতের মাধ্যমে ধ্যানে প্রত্যেক লতীফায় অতিক্রম করে সীনায় লক্ষ্য করলে বুঝতে পারে যে, ঐ পাঁচটি "নূরের" মহাসমুদ্র একত্রিত হয়ে নিজেকে ডুবন্ত করে রেখেছে। মানব সীনা, তখন বিশ্বব্যাপী ঐ "মহানূরে" প্রশস্ত হয় আর নিজেকে তখন বিশ্বব্যাপী দেখতে পায়। মহান আল্লাহ কোথাও স্থান নিতে ভালবাসেন না, তবে মোমেন বান্দার "সীনায়" আসন গ্রহণ করেন। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ *

উচ্চারণ ঃ "আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা ছাদ্‌রাকা।" অর্থাৎ "আমি কি আপনার জন্য আপনার সীনা উন্মোচন করিনি ? (সূরা ইন্‌শিরাহ ঃ ১ আয়াত)

বান্দা মহান আল্লাহ্‌র প্রিয় হতে হলে বিপদে আপদে ধীর-স্থির থাকতে হবে। এবং ধৈর্যের সাথেই পরীক্ষার পর্দাকে অতিক্রম করতে হবে। ধৈর্যের সহিত ইবাদতে সাধক বান্দার এমন পর্যায় উন্নত হলে, বান্দা তখন মা'রেফাতে ভূষিত হন। আর তখন তিনি আল্লাহ্ পাককে চিনতে পারেন।

হযরত মূছা (আঃ) এই ধৈর্য হারিয়েই হযরত খিজির (আঃ)-এর নিকট গুপ্ত জ্ঞান হারিয়েছিলেন। পরে মহান আল্লাহ তাকে এলমে লাদুন্নী দান করেছেন। এই ধৈর্য্যের গুণেই।

মহানবী (সাঃ) এর প্রতি প্রেমই আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত

তার কারণ বেশি নয় তা হলো মানুষের নফস। যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের প্রভাব হতে ক্বালবকে (অন্তরকে) মুক্ত করা না যাবে, নফসকে পরিশুদ্ধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানব দেহের লতীফাসমূহ নূরান্বিত করা সম্ভব নয়। ফলে মানব সীনাও প্রশস্ত হবে না। মানব সীনায় ও ক্বালবে নবী (সাঃ)-এর প্রতি ভালবাসা স্থাপন করতে না পারলে, মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা অর্জন তার পক্ষে মোটেও সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ পাক তাই বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ *

উচ্চারণ ঃ "কুল্ ইন্ কুন্‌তুম্ তুহিব্বু নাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইয়ুহবিব কুমুল্লাহি ওয়া ইয়াগ্ ফিরলাকুম যুনুবাকুম।"

অর্থ ঃ "হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে তোমরা আমার অনুসরন কর। (তা-হলে) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।"

(সূরা আল্ ইমরান ঃ ৩১)

মহান আল্লাহ এ বিষয়ে আরো বলেন ঃ "আল্লাহর রাসুল (সাঃ) তোমাদেরকে যা কিছু প্রদান করেন তোমরা তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক।"

মহানবী (সাঃ)ও এ ব্যাপারে বলেছেন ঃ "যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ এবং বস্তু-প্রাণী (ইত্যাদি) হতে অধিক প্রিয় না হই, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কেহই পূর্ণ মোমেন হতে পার না। (সহীহ বোখারী)

এবং আরও প্রয়োজন আছে তা হলো ঃ কামালিয়াতে নবুওয়্যাতের স্থান ইবাদতের মাধ্যম ত্রয় অতিক্রম, করতে হবে। মহান আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا*

উচ্চারণ ঃ "ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহ্ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা।"

অর্থাৎ "যারা আমার জন্য আমার উদ্দেশ্যে সাধনা করবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৬৯)

তাই সাধনার জন্য মোরাকাবা, মোশাহাদার প্রয়োজন। শেখ সাদী বলেন ঃ যদিও তোমার কথা বেহেশতের মুক্তার চেয়েও মূল্যবান হয়, তবুও যদি বেশি কথা বল, তবে তোমার দেল (আত্মা) মারা যাবে। এ সম্বন্ধে ইসলামের আরো বহু উপদেশ উল্লেখিত রয়েছে।

নাম জাহেরী ও লোক দেখানো ইবাদত শাস্তির যোগ্য : ইবাদতের জন্য মূখ্য উদ্দেশ্য কি?

দেহে প্রাণ না থাক্‌লে তা মৃত। যে কোন ইবাদতে যেমন : নামাজের সূরা, দোয়া, তস্‌বীহ্ এস্তেগফার পাঠ করা; রুকু-সেজ্‌দা করা এ সব মিলে হলো নামাজের বাহ্যিক দিক বা "দেহ" কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, ভয় ভাবনা ও সাধনা হলো সকল ইবাদত-নামাজ, যিকিরের ভিতরের দিক বা প্রাণ।" যার ইবাদত, নামাজ-যিকিরে "এ প্রাণ" নেই তার সকল ইবাদতই মৃত্যুর শামিল।

মহান আল্লাহ! সকল ইবাদতেই তাঁর "মহা নূরময়" জগৎ দেখ্‌বার জন্য আহ্বান করেছেন। যেমন : وَفِىْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ অর্থ : "আমি তোমাদের সীনায় আছি, তবে কি তোমরা আমাকে দেখ্‌তে পাও না?"

(সূরা জারিয়াত ২১ আয়াতে)

আল্লাহ্ আরো বলেন– فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

অর্থ : "যেদিকেই মুখ ফিরাও, আমার কুদ্‌রতের চেহারা দেখ্‌তে পাবে। (সূরা বাকারা ১৪ রুকুতে)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন–

اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ- نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ

অর্থ : "মহান আল্লাহ্! আকাশ পাতালের নূর-নূরের উপর নূর।

(সূরা নূরের ৫ম রুকুতে আয়াত নং ৩৫)

আল্লাহ পাকের সে মহা নূর অতি গোপন অবস্থায় আকাশ পাতাল ব্যাপী সর্বক্ষণ বিরাজমান। তা দেখতে বা উপলব্ধি করতে হয়, সকল প্রকার ইবাদত নামাজ-যিকিরের মাধ্যমে অন্তরাত্মার গভীর ভাব্না সাধনায়, ধ্যান-মনে, মহান আল্লাহ্র প্রেম মহব্বতে। কিন্তু দেহের আর কোন অঙ্গ দ্বারা সে নূর সমূহ আয়ত্ব করা মোটেই সম্ভব নয়।

মহান রাসূল (সা.) বলেছেন :

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থ : (সে নূর আয়ত্ব করতে হলে) এমনভাবে ইবাদত কর যেন, তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখতেছ (যা আধ্যাত্মিক সাধনার সহিত সম্পর্ক) আর তা নাহলে ভাব যে, মহান আল্লাহ্ তোমাকে দেখ্তেছেন। তবেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভালবাসা প্রেম স্থাপিত হবে অন্যথায় নয়। (বুখারী-মুসলিম)

যিকির বা নামাজে দাঁড়িয়ে-বসে রুকু সেজ্দা করা, দোয়া কালাম পড়া, শরীয়তের আরকান ও আহ্কাম মেনে চলার সাথে সাথে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের আশায় ভাবের গভীরতা সাধনায় অন্তরাত্মায় এমন পর্যায় সৃষ্টি হলে "আল্লাহ্র প্রেম-মহব্বতে" ঐ অগ্নিময় গোপন নূরের শিখা অন্তরাত্মায় জ্বলে উঠবেই। যা বান্দার জন্য আল্লাহ্ পাকের মহাদান। এ জন্যই রাসূল করিম (সা.) বলেছেন :

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ : "নামাজ মু'মেনদের জন্য মে'রাজ।"

বান্দার অন্তরাত্মায় নামাজে আল্লাহ্র প্রতি এমন মহব্বত স্থাপন হলে মহান আল্লাহর প্রজ্বলিত নূরের অগ্নিশিখা বান্দার দেহ-মনে "নূরমায়ে" প্রজ্বলিত হবেই। এ সম্বন্ধে নবীয়ে করিম (সা.) আরো বলেছেন : "নিশ্চয়ই যিকির ও নামাজ আল্লাহ্ পাকের নিকটে বান্দার কথোপকথন আবেদন নিবেদন, প্রভূ কেবলা, বান্দার মাঝখানে অন্তরাত্মায় থাকেন।" (বুখারী শরীফ) এ জন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন : قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللهِ অর্থ : "মোমেনের ক্বাল্ব (অন্তর) আল্লাহ্ পাকের আ'রশ সিংহাসন। এরূপে আরো বহু প্রমাণ রয়েছে, যা এ ক্ষুদ্র বহিতে সংকুলান মোটেই সম্ভব নয়।

মানবদেহে ইবাদতের স্থান আত্মায় ক্বাল্বে- তাই ইবাদতের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো : মহান আল্লাহ্কে খুশী-রাজি কর্বার জন্য অন্তরাত্মায় সংযোগ

দিয়ে আল্লাহ্ পাকের প্রেম মহব্বত স্থাপন করতে হয়। সে প্রেম-মহব্বত "ইবাদতের প্রাণ"।

এ পাঠে যা লিখতে চেয়েছি তা হলো : কাঠ মোল্লারা কণ্ঠণালী বা গলার উপরে মুখেই তাদের ইবাদতের খেয়ালের সীমা। অন্তরাত্মায় নেই। তা হলে শুধু কণ্ঠণালী বা গলার উপরে ও মুখে তারা কার জন্য ইবাদত করে? আর যারা শয়তানের বিছানো জালে আট্কা পড়ে মন এদিক-সেদিক ঘুরায়, তারাই বা কার ইবাদত করে? সুতরাং বলা যায়, তারা যে ইবাদত বন্দেগী করে তা মানুষের নিকট নাম জাহেরী ও লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে বরং মহান আল্লাহ্র সহিত ঠাট্টা ও অবহেলা করার শামিল।

এ বিষয়ে রাসূল করিম (সা.) বলেছেন :

اَلْمُتَعَبِّدُ بِلَا فِقْهٍ كَالْحِمَارِ فِى الطَّاحُوْنِ.

"আল্ মুতাআব্বিদু বিলা ফিক্হি কাল্হিমারী ফিত্তাহুন"

অর্থ : "(আল্লাহর জন্য মহব্বতের দৃষ্টি অন্তরে ঠিক না করে) "না বুঝে ইবাদত যিকিরকারী কুলুর বলদের মত।" অর্থাৎ কুলুরা তৈল উৎপাদনে বলদের "কাঁধে-গলায়, বাঁশ বেঁধে ঘুরায় কিন্তু বলদেরা তার কিছুই বুঝে না কাঠ মোল্লারাও তেমনি কণ্ঠনালী বা গলার উপরে মুখেই তাদের চিন্তা ভাব্না ইবাদত-যিকিরে, বক্তৃতায় কি বললো আর কি হলো, অন্তরাত্মায় তার কিছুই বুঝে না খেয়ালও করে না। কুদন, বকন ও সূরা কালাম পাঠ করে নাম জাহেরী ও লোক দেখানো অর্থ ব্যাখ্যাতেই সব শেষ। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ. اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ . اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ : "অতএব, ঐ সকল ইবাদত নামাজ (যিকির) কারীদের জন্য পরিতাপ। যারা নিজেদের ইবাদতে (আল্লাহর প্রতি যথারীতি মহব্বত ভক্তি করে না) অমনোযোগী। যারা শুধু (তাদের ইবাদত) লোকদের দেখায়।" অর্থাৎ আন্তরিকতার সাথে কোন ইবাদত যিকির করে না। তারা পরকালে কঠিন লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মাউন ৪-৬ আয়াত)

সুতরাং প্রত্যেক ইবাদত-নামাজ-যিকিরে গভীরভাবে খেয়াল করে দুনিয়ার অনাসক্তি হয়ে (দুনিয়াকে ভুলে যেয়ে) অন্তরাত্মায়, ধ্যানে সাধনায়,

এক মুহুর্তকাল আধ্যাত্মিকতায় ইবাদত-যিকির আল্লাহর মহব্বতে ও ভয়ে তাঁকে খুশী করার জন্য ডুবে থাকা, হাজার বছরের রোজা নামাজে চেয়েও উত্তম। তাই জীবন ব্যপী-সকল ইবাদত, এমনিভাবেই করতে হবে। আর সকল-ইবাদতের মুখ্য উদ্দেশ্য আমাদের জন্য ইহাই। ইহার অন্যথায় হলে, ঐসব ইবাদত-বন্দেগী, মহান আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

তওবার গুরুত্ব

তওবা অর্থ অনুতাপ, অনুশোচনা, প্রত্যাবর্তন করা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ লজ্জিত হওয়াই তওবা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি আত্মাকে প্রত্যাবর্তন করাই তওবা। আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার হক থেকে তাওবা করলে আল্লাহ তায়ালা বান্দার পাপকে পূণ্যের বদলে পরিণত করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ

উচ্চারণ ঃ ইল্লা মান তাবা, ওয়া আমনা ওয়া আ'মিলা আমালান্ ছালিহান্ ফা, উলাইকা ইউবাদ্দিলুল্লাহ্ সায়্যেআতিহিম হাসানাতিন।

অর্থ ঃ "তবে যে তওবা করে এবং ঈমান আনে, নেক আ'মল করে উহাদের পাপকে আল্লাহ্ পাক পূণ্যের দ্বারা বদল করে দেন।"

(সূরা ফুরকান ঃ ৭০ আয়াত)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন

وَتُوْبُوْا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ "ওয়া তুবু ইলাল্লাহি জামিয়ান্ আয়্যুহাল্ ম'মিনুনা লাআল্লাকুম তুফ্লিহুন।" অর্থ ঃ "ওহে মু'মিনগণ, আল্লাহর প্রতি তওবা কর; তবে তোমরা মুক্তি পাবে।" (সূরা নূর ৩১ আয়াত)

তওবা সম্বন্ধে এইরূপে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

মানুষকে মহান আল্লাহ, ছিফাতে হাক্কীকির দ্বারা সৃষ্টি করছেন। ছিফাতে হাক্কীকির গুণ আটটি যথা ঃ হায়াত, এলেম, কুদরত, এবাদত, সামায়াত, বাছারাত, কালাম ও তাকবীম।

পূর্বেই বলা হয়েছে, উহা লতীফা রূহে বিদ্যমান। উহা সবই আল্লাহর দান। উহা বান্দার নিকট আমানত ঃ বান্দা লতীফা রূহের ধ্যানের ইবাদতে ঐ সব আমানতগুলো আল্লাহ্ পাকের নিকট ফেরৎ দিয়ে বান্দার নিজস্বতা হারিয়ে আল্লাহতে মিলিত হয়ে আমানত রক্ষা করে। তখন বান্দার অস্থিত্বের খিয়াল

থাকে না। ঐ সময় মহান আল্লাহ্ বান্দার লতীফায়ে নফসে "মোলহেমায়" দু'টি ভেদের কথা বান্দাকে জানিয়ে দেন এক. গর্ভ হতে জন্মের সময় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ "হে বান্দা, আমি তোমাকে দুনিয়ায় সবকিছু আমানত হিসাবে দিয়ে পাঠালাম। দেখবো আমি ঐ "আমানত" কোন পথে খাঁটাও।" দুই. মৃত্যুর সময় বলা হবে "হে বান্দা, আমার দেয় "আমানত" সৎভাবে খাঁটাইছ, না-কি? যদি সৎভাবে খাঁটিয়ে থাক, তবে পুরস্কার, নচেৎ শাস্তি দিব।

তওবার তাৎপর্য

লতীফা নফসে পাঁচটি স্তর – নফসে আম্মারা, নফসে লাওয়্যামা, নফসে মোৎমাঈন্যাহ, নফসে মোলহেমো ও নফসে মোহাদ্দেছা।

নফসে আম্মারা যাবতীয় কুকর্ম ও কুচিন্তার উৎস। ইহার বিরাট শক্তিশালী বাহিনী আছে। যা শয়তানের মূলকেন্দ্র, কামক্রোধ, লোভ মোহ, হিংসা-ফাসাদ, লোক দেখানো ইবাদত, মনোভাব, কামনা-বাসনা, ইত্যাদি। তার শাখা। তারপরও তওবা কবুল হয়। যেমন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۔ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔

উচ্চারণ ঃ "কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আস্‌রাফু আ'লা আন্‌ফুসিহিম্ লা- তাক্বনাতু মির রাহমাতিল্লাহ্-ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয্ যুনুবা জামি আ'ন ইন্নাহু হুয়াল্ গাফুরুর্ রাহিম।"

অর্থ ঃ "বলঃ হে আমার বান্দা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছ, তারা আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতীতের গোনাহ্ মা'ফ করবেন। নিশ্চয়ই তিনি বড় ক্ষমাশীল্, দয়ালু।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ "ওয়ালা তা'য়আসু মির্‌রাওহিল্লাহি-ইন্নাহু লা ইয়াই আসু মির্ রাওহিল্লাহি, ইল্লাল্ ক্বাওমুল্ কাফিরুন।"

অর্থ ঃ "আর আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা আ'লার রহমত হতে কেবল সে সমস্ত লোকই নিরাশ হয় যারা কাফের।"

(সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭)

এ রকম আরো বহু আয়াত রয়েছে নবীয়ে করিম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلتَّائِبُ حَبِيْبُ اللهِ

উচ্চারণ ঃ " আত্তায়িবু হাবিবুল্লাহি।" অর্থ ঃ "তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু।"

নফসে আম্মারার উপরে নফসে লাওয়্যামার স্তর। ইহা কখনও আল্লাহ্ তা'আ'লার দিকে আবার কখনও পাপের দিকে ধাবিত হয়। কখনও "নূরময়' উর্দ্ধ জগতের দিকে, আবর কখনও নফসের অন্ধকারের দিকে।

নফসে লাওয়্যামার উপরে নফসে মোৎমাঈন্যাহ। এই নফসে মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, বান্দাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। ইহা "নূরময়" জগতের নফস। এ স্তরে সাধক বান্দাগণ আল্লাহ্ পাকের "ওলী"। ইহা বেলায়েতে ছোগরার সাত আসমান একত্রের স্তর। সাধক বান্দাগণ ইবাদতে যিকিরে মগ্ন থাকেন, শান্তি লাভ করেন।

নফসে মোৎমাঈন্যাহর উপরে নফসে মোল্হেমা; ইহা হতেই বান্দার এলহাম, খাঁটি স্বপ্ন হয়। এর পর নফসে মোহাদ্দেছা, এই স্তর দু'টি লতীফায়ে রূহে অবস্থিত "নূরময়" জগতে।

নফসে মোহাদ্দেছা হলো নবী (আঃ) দের নফস। এ নফস প্রায় সব সময় কলুষমুক্ত থাকে।

খাওফ ও তাকওয়া

মহান আল্লাহকে চেনা-জানা ও মানার জন্য খাওফ ও তাকওয়া গুন দু'টি অর্জন করা একান্ত জরুরী। "খাওফ" অর্থ আল্লাহর প্রতি ভয়, আর "তাকওয়া" অর্থ আল্লাহকে ভয় ও পাপ হতে নিজকে পরহেজ করা বা বাঁচিয়ে রাখা। অর্থাৎ সকল অন্যায় কাজ থেকে নিজকে দূরে রাখা।

বান্দার দিলে আল্লাহ পাকের প্রতি "ভয়" বা পরহেজগারী সৃষ্টি হলে ভাল মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করত ঃ বান্দা "ভালটা" গ্রহণ ও মন্দটা" অবশ্যই ত্যাগ করে "ভালোর" দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করতে চাইবে। দিলের এই অবস্থাকেই তাকওয়া বলে।

আর "খাওফ" থেকেই বান্দার দিলে এই তাকওয়া উৎপন্ন হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ

উচ্চারণ ঃ "ইয়া আয়্যুহাল্ লাযীনা আমানুত্ তাক্বুল্লাহা।" অর্থ ঃ "ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরা মায়দা ঃ ৩৫ আয়াত)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ "ওয়াত্তাকুল্লাহা – ইন্নাল্লাহা খাবিরুম্ বিমা তা'মালুন।"

অর্থ ঃ "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ খবর রাখেন, তোমরা যা কর।" (সূরা হাশর ঃ ১৮ আয়াত)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ *

উচ্চারণ ঃ "ফালা তাখ্‌শাউন্ নাছা ওয়াখ্‌শাওনী।"

অর্থ ঃ তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং এবং আমাকেই ভয় করো।" (সূরা মায়েদা ঃ ৪৪ আয়াত)

এভাবে আরো বহু আয়াত রয়েছে। "খাওফ ও তক্বাওয়া" দিলের (আত্মার) ঢাল শয়তান নফসে আম্মারায় যখন পাপ কাজের তীর মারে তখন বান্দা "খওফ ও তাক্বওয়ার" ঢালের মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। নিজেকে পাপ হতে রক্ষা করে। তখন মহান আল্লাহ্ তার প্রতি খুশী হন। "সেও" আল্লাহর প্রতি খুশী থাকেন। তাই আল্লাহ পাক বলেন ঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

উচ্চারণ ঃ " রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম্ ওয়া রাদু আন্‌হু-যালিকা লিমান্ খাশিয়া রাব্বাহু।" অর্থ ঃ "আল্লাহ্ তাদের প্রতি খুশী। তারাও আল্লাহতে খুশী। ইহাই তারা, যারা তার প্রভুকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ ঃ ৮ আয়াত)

আর ইহাই নাফসে মোৎমাঈন্যাহ। "তাক্বওয়াহ্ অর্জিত হয়" হাক্বীকত আহম্মদীর মাকামে, (যা খফীর শেষ দায়েরা) এই দায়েরা আল্লাহর "মহানূরের" সমুদ্রের গভীরে অবস্থিত। তাই আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

উচ্চারণ ঃ " ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুত্তাক্বীনা।" অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক, পরহেজগারগণকে ভাল বাসেন ।" (আলে ইমরান্ ৭৬ আয়াত)

দুনিয়ার জন্য মানুষের মান–মর্যাদা বাড়ে অর্থ সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তি ও বংশের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে, আর পরকালের মান-মর্যাদা বাড়ে " তাক্বওয়ার" ভিত্তিতে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

উচ্চারণ ঃ "ইন্না আকরামা'কুম ইন্দাল্লাহি আত্‌ক্কাকুম।"

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে মর্যাদায় ও গৌরবে সর্ব শ্রেষ্ঠ, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আল্লাহ্ ভীরু, পরহেজগার।"

(সূরা হুজরাত ঃ ১৩ আয়াত)

হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা উপস্থিত লোকগণ দয়াল নবী (সাঃ) কে বললেন ঃ আপনার উম্মতদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বিনা হিসাবে বেহেশত পাবেন কি ? দয়াল নবী (সাঃ) বললেন ঃ "যে ব্যক্তি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিতে নিজের পাপ স্বরণ পূর্বক রোদন করবে, সে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে।"

মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কতগুলো সৎ উপদেশ

উপদেশগুলো প্রত্যেহ খিয়াল রেখে নিজ কর্ম পথে চলা উচিৎ।

* আল্লাহ্ পাককে যেসব কাজে ভয় করে তাকে সবাই ভয় করবে, আর তা-না হলে তাকে কেউ ভয় করবে না।

* যে আল্লাহ্ পাককে ভয় করে সে কম কথা বলে।

* যে নির্জনতাকে ভয় মনে করে লোকের সাথে মেলামেশাই শান্তি মনে করে, সে শান্তি হতে দূরে সরে পড়ে।

* আল্লাহ্ পাক কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন, তখন তাকে বহু বিপদে ফেলে পরিক্ষা করেন। আর যখন কাউকে দুশমনরূপে গ্রহণ করেন, তাকে ধন-দৌলত বাড়িয়ে দিয়ে পরকালের জন্য বিপদে ফেলে রাখেন।

* বেহেশতে মানুষের ক্রন্দন, "আশ্চর্যজনক" তেমনি দুনিয়ার হাসি খুশী "আশ্চর্যজনক"।

* আল্লাহ প্রিয় বান্দার নির্জনে থাকলে বহু উপকার হয়। আর দুনিয়ার লোক নির্জনে থাকলে ক্ষতির কারণ হয়।

* মহান আল্লাহ পরকালের ধন না কমিয়ে দুনিয়াতে কাউকে ধন দেন না।

* আল্লাহ পাকের দীদার লাভের পূর্ব পর্যন্তই যত লাফালাফি, কিন্তু তাঁর দীদার লাভ হলে ঐ লাফালাফি আর থাকে না, সে তখন চুপ হয়ে যায়।

* আল্লাহ পাক যাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন, তাকে তিন্‌টি স্বভাব দান করেন।

(ক) নদীর মত উদারতা,

(খ) সূর্যের মত দয়া,

(গ) মাটির মত বিনয়।

* নফল ইবাদতের চেয়ে আল্লাহপ্রেমিক লোকের সাক্ষাৎ উত্তম। আর মন্দ কাজ হতে মন্দ লোকের সঙ্গ ধরা অধিক ক্ষতিকর।

* যিনি নিজেকে আল্লাহপ্রেমিক বলে পরিচয় দেয়, তিনি মূর্খ: আর যে নিজেকে মূর্খ বা অধম বলে পরিচয় দেয়, তিনিই আল্লাহ প্রেমিক।

* সর্বদাই এমন স্থানে বাস করবেন যেখানে নেক কাজের উপদেশ ও পাপ কাজের নিষেধের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নূরে ডুবে থাকা।

* আল্লাহ পাকের "যিকির" হতে "যে" দূরে রাখে সেটাই "দুনিয়া"।

* যার "উদর" খাদ্যে ভরা আর "অন্তর" দুনিয়ার মহব্বতে ভরা তিনি নিজেকে ও আল্লাহ পাককে চিনতে পারেন না।

* যে গুনাহ মা'ফের জন্য মৌখিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, অন্তরে ক্ষমা চায় না, সেও মিথ্যাবাদী।

* মহিবতে পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে ছবুর থাকা খুব ভাল, তবে তার মহিবতের উপর খুশী থাকা আরো ভাল।

* প্রত্যেক অন্যায়ের শাস্তি আছে, আর আল্লাহ প্রেমিকদের শাস্তি, হলো– আল্লাহ পাকের যিকির (স্বরন) হতে দূরে থাকা।

* আল্লাহর "ওলীরা" সব সময় আল্লাহর কাছে হাজির থাকেন, এবং জন সমাজে বাস করেও অন্তরে সর্বদাই আল্লাহ্র মহব্বতে লিপ্ত থাকেন, তিনিই আল্লাহর প্রিয়।

* আল্লাহ পাকের যিকির (স্বরণ) সব সময় করতে হয়, বাদ দেয়া উচিৎ নয়। কারণ পানি যতক্ষণ চলমান থাকে ততক্ষণ পরিস্কার নাকে। আর পানির স্রোত বন্ধ হলে শেওলা ধরে।

* তিন অবস্থায় যার মন আল্লাহর দিকে হাজির না থাকে সে মিত্যাবাদী।

(ক) কুরআন শরীফ তিলাওয়াতকালে।

(খ) নামাজ পড়ার সময়।

(গ) যিকিরের সময়।

* ইবাদত এমন নির্জন স্থানে করবেন, যেন কেউ আপনাকে না দেখে এবং আপনিও কাউকে দেখতে না পারেন। এটাই উত্তম।

* যদি আপনি জানেন কে আপনার দুশমন (শত্রু) এবং আপনার গীবত (নিন্দা) করে, পারলে তাকে কিছু উপহার দিবেন। কেননা সে তো আপনার উপকার করলো, এ জন্য তাকে এহসান করা আপনার কর্তব্য। কারণ দুশমন ও গীবতকারীর নেকীগুলো যার গীবত বা দুশমনী করে সে পায়।

* যে ইবাদতে মন খুশী হয় উহাই কবুলের যোগ্য।

* "মনের (আত্মার) চক্ষু" খুললে, বাইরের "চক্ষু বন্ধ" হয়ে যায়। তখন মহান আল্লাহ ছাড়া, সে আর কিছু দেখে না।

* কেউ যদি আপনাকে নামাজ-যিকির, বা তাসবীহ পড়া দেখে, তাতে যদি আপনি খুশী হোন এতে কোন ইবাদতই কবুলের যোগ্য হবে না, আর যদি খুশী না হোন তবে হাজার লোক দেখুক কোনোই যায় আসে না। যদি তা মহান আল্লাহকে খুশী করা নিয়ে হয়।

* হালালভাবে রুজি উপর্জন করে এক লোকমা খাদ্য খেলে, সারা দিনের নফল ইবাদত হতে উত্তম। কয়েক দিনের খাদ্য জমিয়ে রেখে আহার করলে আল্লাহর উপর ভরসা কম হয়।

* আল্লাহ প্রেমিক ব্যক্তি তিনিই যিনি আল্লাহ পাকের মহব্বতের "নূরে" ডুবে থাকে।

* আল্লাহ পাকের এমন গুণাবলী যার মধ্যে আছে সে-ই আল্লাহ প্রেমিক।

* সারা দুনিয়ার মানুষের বদলে যদি আমাকেই দোজখের আগুনে ফেলে, আর আল্লাহর মহব্বতের কারণে, তাতে আমি হাসি মুখে ধৈর্য ধরি, তবু তাঁর প্রতি প্রেমের হক বা তার নেয়ামতের শুকরিয়া আমার দ্বারা আদায় হবে না।

* আল্লাহ পাককে চিনবার উপায় খারাপ মানুষ হতে দূরে থেকে আল্লাহর তত্ত্বে ও যিকিরে ডুবে থাকা। তাতে একবিন্দু তত্ত্বের সন্ধান পেলে ঐ তত্ত্বজ্ঞানী এতই আনন্দ পায় যে, বেহেশত পেলেও তত আনন্দ পাওয়া যাবে না।

* আল্লাহ প্রেমিক বেহেশতের পোষাক, তবে তাঁরা আল্লাহ প্রেমের তুলনায় বেহেশতকে কাঁটা বলে মনে করেন।

* কোন মুসলমান ভাইকে শরম দেয়ার মত কোন পাপ নেই।

* যাহেরী জিহবার পরিবর্তন হয়, বাতেনী জিহবার পরির্বতন নেই। মানুষ যখন যিকির করতে-করতে অন্তর (আত্মা) পর্যন্ত পৌঁছে তখন আল্লাহ ছাড়া তার অন্তরে আর কিছু থাকে না, তখন তার যাহেরী জিহবা অচল ও বোবা হয়ে যায়, তখন সে যা বলে, তা আল্লাহর পক্ষ হতেই বলে।

* যে নিজেকে ভুলে জীবন আল্লাহ পাকের জন্য বিলিয়ে দিয়েছে, সেই সম্মানের উচ্চ আসনে পৌঁছেছে।

* মানুষের শরীর অন্ধকার ঘর। অন্তর হলো তার বাতি, এই অন্তর যার নেই সে অন্ধকারেই বাস করে।

* সাধ্যমত আল্লাহকে খুশী করবার জন্য কাজ করা নিজের খুশীর জন্য কাজ করলে আল্লাহর দীদার পাওয়া যাবে না।

* যার চিন্তা পবিত্র তাঁর কথাও পবিত্র তারই সবকাজ ভাল।

* আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধগুলো মান্য করতে ধর্য ধরে অটল থাকার নামই ইবাদত বা যিকির অর্থাৎ আল্লাহপ্রেম।

* বড়-ভাল বক্তা হলেই জ্ঞানী বা বড় আলিম হয় না, ইলম বা জ্ঞানী, আ'মল অনুযায়ী হয়। তাতে ইলম বা জ্ঞান অল্প হলেও, সে ই-প্রকৃত আলিম বা বড় জ্ঞানী।

* আল্লাহ পাকের ইবাদত করার নামই শরীয়ত। তাঁকে ইবাদতে তালাশ করার নামই তরিকত। এবং তাঁর কুদরতের চেহারা ইবাদতে দেখতে পাবার নামই হাক্কীকত। অতঃপর নিজকে ইবাদতে হারিয়ে তাঁর সহিত চিনি-পানির মত মিশে যাওয়াই হলো ঃ মা'রেফত।

* যখন আপনি বুঝবেন যে, আমি তো কিছুই জনি না এবং এতে লজ্জা হয়। মা'রেফতে উচ্চস্থানে পৌছার তাঁর তখনই সম্ভব হয়।

* যে মহান আল্লাহর তালাশে অস্থির, তাঁকে সারা দুনিয়ার সম্পদ দিলেও তিনি খুশী নন।

* যে "দুনিয়াকে" বন্ধু জানে সে কখনও আল্লাহর বন্ধু হতে পারে না। আর যে "আল্লাহর" বন্ধু হয় দুনিয়ার সব তাঁর বন্ধু হয়ে যায়।

* খাঁটি মানুষের লক্ষণ তিনটি ঃ

(ক) সম্মান পেলে নিজকে নিচু মনে করে।

(খ) ধন-দৌলতের মালিক হলে গরীব হয়েথাকেন, অহংকার করেন না।

(গ) লোকে সুনাম করলে নিজেকে গোপন করেন।

* যে নিজেকে ভাল মনে করে সেই ধর্মকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল।

* সত্যের পথে মানুষ নেই, মানুষের গড়া পথেও সত্য নেই।

* আল্লাহকে যে তালাশ করে সে তাঁর তওবার ছায়াতলেই বাস করে।

* অন্তর বা আত্মাতে আল্লাহকে মেনে নেয়া তাকেই বলা যায় যাকে কোন পদার্থই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

* সমস্ত সৃষ্টিজগতকে "ফানার" স্তরে দেখতে পাওয়াই মা'রেফাত।

* যখন মানুষ, ফানা ফিল্লাহ (নিজ অস্তিত্ব আল্লাহতে বিলুপ্ত) হয়, তখন সে আল্লাহর সাথে নতুন জীবন লাভ করে।

* মহান আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস পূর্ণ হয় তার কাছে সকল "বিপদ" নে'য়ামত হয়। আগুনে ফেলে দিলেও তাঁর কষ্ট হয় না। পাথরের আঘাতেও না।

* যে-নেয়মতের শোকরিয়া আদায় করে তাঁর ধ্বংস নেই। আর যার শোকরিয়া নেই তার স্থায়ীত্বও নেই।

* সমস্ত মানুষই মুসাফির (ভ্রমণকারী) দুনিয়া দরিয়ার মত, তার শেষ সীমা পরকাল, তা পার হবার নৌকা হলো ঃ "নেকী"।

* লোকেরা বাইরের প্রতি নযর করে থাকে কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরের (আত্মার) প্রতি নযর করে থাকেন। মানুষের আত্মা, আল্লাহ পাকের আ'রশ বা সিংহাসন।

* "পাতিলে" যা থাকে তাই বের হয়। তেমনি "আত্মায়" ভাল থাকলে তার কাজে কর্মে, "ভালই" বের হবে। আর মন্দ থাকলে মন্দটাই বের হয়ে আসবে।

* যিনি আখেরাতের (পরকালের) কথা সর্বদাই চিন্তা করেন, তাঁর ফল তিনি আখিরাতেই পাবেন।

* কৃপণতা ও দানশীলতা-মান (ইজ্জত) ও অপমান, এই চার বস্তু যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে সমান সমান না থাকে, সে পর্যন্ত মানুষ কখনও কামিল (পরিপূর্ণ) মানুষ হতে পারে না।

* যখনি আপনার নিজ আত্মাকে আল্লাহর নূরের মধ্যে ডুবে থাকতে পাবেন, তখনি আপনি নিজকে চিনতে পাবেন (আপনি কে)? আর তখনিই আপনি, আল্লাহ পাকের আসল "বান্দা" হয়ে যেতে পারবেন।

* যার "চক্ষু" আল্লাহর সৃষ্টি বস্তুকে শিক্ষা হিসাবে দেখে না, তার অন্ধ হওয়াই ভাল। আর যার "শরীর" আল্লাহ্ পাকের খেদমতে কাজে লাগায় না তার মৃত্যুই ভাল।

* আল্লাহ্ পাক আপনার সাথে পরকালে যেরূপ ব্যবহার করবেন দুনিয়াতে আপনি সেরূপই করে যাবেন যদি ভাল চান, তবে ভালই করে যাবেন আর মন্দটা চান, তবে মন্দটাই করে যাবেন।

* যার জ্ঞান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত, আর ঐ বিশ্বাস আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় পর্যন্ত, আর যে ভয় নেক কাজ পর্যন্ত এবং ঐ সব কাজ আল্লাহ্‌র "নূর" দেখা পর্যন্ত পৌঁছায়নি তা সব ধ্বংস হয়ে হয়ে যাবে।

* যে আল্লাহ্ পাককে চিনতেই পারেনি সে অধম-বোকা।

* নিজের ইচ্ছা বাদ দিয়ে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়াই "আল্লাহ্‌র প্রেম বা মহব্বত"।

* মানুষ, মানুষ হয় সৎ স্বভাবের দ্বারা। চাল-চলন বা আকৃতির দ্বারা নয়।

* আল্লাহ্ পাক ও বান্দার মধ্যে চারটি সমুদ্র বাধা হয়ে রয়েছে, যে পর্যন্ত ঐ সমুদ্রগুলো পাড়ি দেয়া না হবে, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সাথে বান্দার মিলন সম্ভব নয়।

(ক) দুনিয়া অর্থাৎ দুনিয়ার সব চিন্তা বা দিয়ে পাড়ি জমাতে হবে।

(খ) "মানুষ" কুকর্মের মানুষ হতে দূরে থেকে ঐ সমুদ্র পার হতে হবে।

(গ) "শয়তান" তার শয়তানীসমুহ্ হতে পাড়ি জমাতে হবে।

(ঘ) "নফস বা রিপুর" সমুদ্র হতে পাড়ি জমাতে হবে।

* খুব হুশিয়ার আলিম আর মূর্খই হোক, আর মহা পন্ডিতই হোক, যে ব্যক্তি কুরআনের আদেশ নিষেধ মানে না, রাসূল করিম (সাঃ)-এর শিক্ষা জানে না তার অনুস্বরণ কেউ করো না। কারণ "জ্ঞান" কুরআন ও হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর বাইরের "জ্ঞান" (সব) দুনিয়া।

* ইবাদতের মধ্যে বান্দার অন্তর (আত্মার) চোখে যখন আল্লাহ্‌র কুদরত প্রকাশ হয় ও আল্লাহ্‌র "নূরের" মধ্যে মিলিত হওয়া সম্ভব হয়, তখনই "ইবাদত" কবুল হয় এবং আল্লাহ্ পাকের সহিত বন্ধুত্বও লাভ হয়। তখন "বান্দা" আল্লাহ্ ছাড়া আর কিছু দেখে না, বুঝেও না। আর আল্লাহ্‌র প্রেমে অস্থির হয়ে যে নিশ্বাস ফেলে দেয়া হয়- তাতে "আল্লাহ্ ও বান্দার" মধ্যের পর্দা জ্বলিয়া যায়। "আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার " তখন একাকার হওয়া যায়।

* আপনি যখন ইবাদতে লিপ্ত হবেন তখন বহু ডাকাত এসে আপনার অন্তরে উপস্থিত হয়ে জাল বিস্তার করতে থাকে। অর্থাৎ ধোঁকা মারার জাল, লোভ লালসার জাল বহুদিকে মন (আত্মা) ফিরানোর জাল, যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। ঐগুলো পরিস্কার করে আল্লাহ্‌র মহব্বত পাবার আশায় ইবাদত করতে হবে।

* মওত হতে "ফওত" মারাত্মক, কেননা সৃষ্টি হতে পৃথক হবার নাম "মওত" আর মহান আল্লাহ হতে পৃথক হবার নাম"ফওত" (বিনাশ)।

* "আল্লাহর" ইবাদত বা যিকির" সমস্ত গুনাহকে ডুবিয়ে দেয়, আর আল্লাহর প্রতি ভালবাসা দুনিয়ার সকল ভালবাসাকে ভুলিয়ে দেয়।

* যে দুনিয়াতে যাকে "ভলোবাসবে" কিয়ামতে সে "তারই" তালাশ করবে।

* আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দার গুণ হলো- " বিপদ হলেই "যার" ধৈর্য্যের গুণ" ফুটে উঠে।

* টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, সাপ-বিচ্ছুর মত, বিষ-ঝারার মন্ত্র না শিখে সাপের গায়ে হাত দিবেন না। প্রশ্ন ঃ তার আবার মন্ত্র কি? উত্তর ঃ মন্ত্র- হালালভাবে উপার্জন, সৎপথে ব্যয়। তা হলে ঐ ধন সম্পদ পরকালে কবরে, সাপ-বিচ্ছু হবে না।

* ধনী লোকের দুইটি মহাবিপদ ঃ

(ক) "সারা জীবন" যে ধন কামাই করছে মৃত্যুর সময় তা কেড়ে নেয়া হবে। (খ) "পরকালে" তা হালাল উপায়ে না হারাম উপায়ে উপার্জন করছে, তার হিসাব তিলে তিলে আদায় করে নেয়া হবে।

* যার তিনটি গুণ আছে সে- "জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান"।

(ক) মহান আল্লাহর মহব্বতে, ভয়ে দুনিয়া ত্যাগী।

(খ) মৃত্যুর পূর্বেই কবরের, পরকালের আসবাব সংগ্রহ করে রাখে।

(গ) পরকালে আল্লাহ পাকের সাথে মিলবার আগেই ইবাদত যিকিরের মাধ্যমে তাঁকে (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করে রাখে।

* যার বহু আছে আরো বহু পাবার জন্য অস্থির হয়ে জীবন কাটে, তাহলে তো দুনিয়াতে তার শান্তিই হলো না। আর পরকালেও, সে ধনের হিসাব দিতে-দিতে, সে অস্থির হয়েই থাকবে। তা হলে তার শান্তি হবে কোথায় ?

* যে মহান আল্লাহর সাথে বন্ধত্ব রাখে সে নিজের ইচ্ছাকে শত্রুরূপে জানে।

* যে প্রয়োজনীয় খাদ্য, প্রয়োজনীয় বস্ত্র ও প্রয়োজনীয় বাসস্থান ছাড়া আর কিছু চায় না, সেই "ধনী"। আর যার বহু আছে আরো বহু পাওয়ার চায়, এর জন্য কাঙ্গাল হয়ে আরো তালাশ করে এবং তার অর্জনে ব্যস্ত থাকে সে ই গরীব।

* যে ব্যক্তির মন (আত্মা) মহান আল্লাহর ইবাদত যিকিরে খুশী হয় দুনিয়ার সকল প্রাণীই "তাঁর" খেদমত করতে খুশী হয়। আর যার অন্তরের

চোখ, আল্লাহর পাকের ইবাদত বা যিকিরে আলোকিত হয় সমস্ত প্রাণীর চোখ "তাকে দেখে" আলোকিত হয়।

* পাচঁ ব্যক্তির সহিত সংশ্রব রাখা ঠিক নয় ঃ

(ক) কৃপণ : যে সর্বদা নিজের লাভের জন্য আপনার ক্ষতি করবে।

(খ) মিথ্যুক : তাকে সঙ্গে রাখলে ঠকবেন সে আপনার হিতকামী হতে পারে, কিন্তু নিজ মূর্খতার দরুণ আপনার অকল্যাণ ঘটাবে।

(গ) নির্দয় : অভাবের সময় সে আপনাকে ধ্বংস করবে।

(ঘ) কাপুরষ : আপনার প্রয়োজনের সময় সে আপনাকে ত্যাগ করবে।

(ঙ) ফাসেক : তার লোভ লালসা, অত্যন্ত বেশী। নিজ স্বার্থের খাতিরে সে আপনাকে প্রাণে হত্যাও করতে পারে।

* ধীরস্থির ও চঞ্চলহীন ব্যক্তিই প্রকৃত মু'মেন। যা মনে হয়, তাই মু'মেন ব্যক্তি করেন না এবং মুখে যা আসে তাই তিনি বলেনও না।

* দুনিয়াদার লোক তিনটি আক্ষেপ নিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করে।

(ক) ধনার্জন ও ধন সঞ্চয়ে তৃপ্তি না পাবার দুঃখে।

(খ) আশা অপূরণ থাকার দরূণ মনোকষ্টে।

(গ) পরকালের পাথেয় সঞ্চিত হয়নি বলে ভয়।

* যাকে আল্লাহ্ পাক অবহেলা ও ঘৃণা করেন, শুধু সে-ই- দুনিয়ার ধণের প্রতি ব্যস্ত থাকে।

* প্রত্যেক বস্তুরই যাকাত আছে। আর আকলের (জ্ঞানের) যাকাৎ হচ্ছে, গভীর চিন্তা গবেষণা। এ কারণেই মহানবী (সাঃ) সর্বদা চিন্তিত ও ধ্যানে মশগুল থাকতেন। শরীরের যাকাৎ রোজা।

* সংসার বা ব্যবসা এবং যে কোন উপার্জন কর্মে প্রবেশ করা সহজ কিন্তু তা হতে বের হয়ে আসা (মুক্তির জন্য) খুব কঠিন।

* যে ব্যক্তি আপন ভাই-বন্ধুর সাথে বাহ্যিক ভালবাসা দেখায় ও অন্ত রে শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর অভিশাপ করেন। এরূপ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ অন্ধ ও বধির করে উঠাবেন।

* আল্লাহ্ পাকের সম্বন্ধে যে যত অধিক জ্ঞান লাভ করেন সে তত বেশী তাঁর ইবাদত যিকিরে, মশগুল থাকেন। দুনিয়ার কারো নিকট হতে কোন প্রকার সাহায্যপ্রার্থী না হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব।

* "যখন কোন গুনাহ্ করতে চান তখন তাঁর রাজ্যের বাইরে যেয়ে করবেন।" তাঁর রাজ্যের বাইরে তো কোন জায়গা নেই, তাহ্লে এটা উচিৎ নয় যে, যার রাজ্যে বাস করবেন, তাঁরই বিরুদ্ধাচারণ করবেন।

* এমন স্থানে যেয়ে গুনাহ্ করবেন যেন তিনি (আল্লাহ্) আপনাকে না দেখেন। এমন জায়গা তো কোথাও নেই। তা হলে তাঁর দেয়া জীবনটা নিয়ে, তাঁর দেয়া রিজিক খেয়ে তাঁর রাজ্যে বাস করবেন, আবার তাঁরই সামনে গুনাহের কাজ করবেন? "এটা কিসের পরিচয় হলো" ?

* যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই জানে না, বুঝেও না এবং কাকেও চিনেও না, একমাত্র আল্লাহর প্রিয়রাই তাঁকে সম্মান করে থাকে। তা ছাড়া আর কেউ তার সম্মান বুঝে না। এমন ব্যক্তিই মা'রেফাতপ্রাপ্ত হোন এবং তিনিই তত্ত্বজ্ঞানী।

* যে পর্যন্ত আপনার শত্রু আপনার নিকটে আপনার ব্যবহারে শান্তি না পাবে সে পর্যন্ত আপনি কখনো ভাল মানুষে পরিণত হতে পারবেন না।

* প্রতি মুহূর্তে নিজ জীবনের কার্যাবলীর হিসাব নেয়া অর্থাৎ ভাল করছেন, না মন্দ কাজ করছেন, ইহার চিন্তা করা এটাই প্রকৃত মুসলমানিত্ব।

* "যিনি জনসমাজে বাস করেও তাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহর মহব্বতে ব্যস্ত থাকে। তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী বা খাঁটি মুমিন।"

* "প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর দাস হয়ে থাকাই দাসত্ব, ইহার নামই বান্দা।"

* অসুস্থ আত্মার চারটি লক্ষণ

(ক) যে ইবাদত করে কিন্তু তার স্বাদ মজা পায় না।

(খ) সব সময় আল্লাহর প্রতি ভয় অন্তরে থাকে না।

(গ) সকলকে নছীহতের চোখে দেখে না।

(ঘ) হাদিস ও কুরআন শুনেই কিন্তু তা ভাবেও না, বুঝেও না।

* পাপের কারণে আল্লাহর প্রতি লজ্জিত হওয়া এবং ভয়ে তাঁর প্রতি মনকে (আত্মাকে) রুজু করাই তওবা।

* দেহের সাত অঙ্গের তওবা। যথা ঃ (১) হারাম বস্তুর চিন্তা ত্যাগ করা "মনের তওবা"। (২) হারাম বস্তুর দর্শন হতে বিরত থাকা "চক্ষুর তওবা" (৩) অন্যায় কথা শ্রবণে বিরত থাকা "কানের তওবা" (৪) হারাম বস্তু গ্রহণে বিরত থাকা "হাতের তওবা"। (৫) নিষিদ্ধ পথে গমন না করা "পায়ের তওবা"। (৬) হারাম বস্তু না খাওয়া "পেটের তওবা"। (৭) যিনা বা অপমানের কাজ হতে সরে থাকা "গুপ্ত অঙ্গের তওবা।"

* যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্ধান পেয়েছেন, তাঁর কোন ভয়ের কারণ নেই। "আল্লাহর স্মরণ" ছাড়া দুনিয়ার সব জিনিস তাঁর থেকে দুরে সরে গেলেও না।

* দুনিয়া কি ? "আল্লাহর স্মরণ" যা থেকে দূরে রাখে, উহাই দুনিয়া (সংসার)।"

* অধম কে ? যে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেনি বা ইবাদতে তাঁকে তালাশ করেনি।

* কার সঙ্গী হয়ে থাকবেন? যার মধ্যে "আমার তোমার" এ দাবী নেই। সবই একমাত্র আল্লাহর।

* যা গত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে হবে তার চিন্তা করো না। বর্তমান সময়টাকে মূল্যবান মনে করবেন।

* বিপদ উপস্থিত হলে ধৈর্য্য ধরে থাকবেন তখন আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গী হয়ে থাকবেন। বিপদে ধৈর্য্যহারা ও আনন্দে আত্মহারা হবেন না।

* আল্লাহ পাক যাকে ভালবাসেন পরিক্ষার জন্য তার উপর এক অত্যাচারী নিযুক্ত করেন, যেন -সে তাকে অনবরত কষ্ট দেয়।

* কথায় জাঁকজমক নর্তন, কুর্দন ও মনের বাসনা, এগুলো শুদ্ধ মনের বাইরের জিনিস। আর শুদ্ধমনের ভিতরে জিনিস হলোঃ আল্লাহর ধ্যানের নীরবতা, নিস্তব্ধতা, যা শান্তির জন্য আল্লাহ ভীতি বিদ্যমান থাকে।

* দোযখের জ্বলন্ত আগুন তার জন্যই, যে মহান আল্লাহকে চিনতে পারেনি, কিন্তু আল্লাহ প্রেমিকরা তাঁর মহব্বতের আগুনে জ্বলতে থাকেন।

* যিনি আল্লাহ পাককে চিনেছেন, তিনি আগুনকে শাস্তি দেন। আর যে আল্লাহকে চিনতে পারেনি, আগুন তাকেই শাস্তি দেয়।

* আল্লাহ পাকের নিকট "দুনিয়া" মশার একটি ডানা হতেও মূল্যহীন, এই মূল্যহীন দুনিয়ার প্রতি যার লোভ আছে তার আবার মূল্য কি?

* যে মানুষের সাথে বেশী বেশী মিলামিশা করে, সে সত্য হতে দূরে সরে পড়ে।

* নেককার লোকের মন (আত্মা) বেহেশত লাভের লক্ষ্য নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। আর আল্লাহর "নিকটবর্তী ওলী প্রেমিকগণ" আরো অগ্রগামী উন্নতশীল, কেননা তাঁরা আল্লাহ প্রেমের মহব্বতে ডুবে সত্তা বৃদ্ধি পায়। তাঁদের উন্নতি সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁদের আল্লাহ প্রেমের সত্তা অসীম।

* যাদের "অন্তর" পার্থিব দুনিয়ার কিছু সম্পদের লোভে পড়ে মগ্ন থাকে, তাদের মনে (আত্মায়) নিম্নে পাঁচটি বিষয় স্থান পায় না ; যথা ঃ

(ক) আল্লাহ তা'আলার প্রতি প্রকৃত ভয়।

(খ) আল্লাহর সাথে প্রেম।

(গ) তাঁর রহমত পাবার আশা।

(ঘ) আল্লাহর প্রতি লজ্জা শরম।

(ঙ) আল্লাহর সাথে পরম বন্ধুত্বতা।

* আল্লাহ পাকের কাছে "বুদ্ধিমান জ্ঞানী ঐ মানুষ, যে পবিত্র কুরআনের গোপনভেদ ভেবে বুঝতে পারে এবং ঐ ভেদ সম্মন্ধে তত্ত্ব অনুসন্ধান করে।

* যারা ইবাদতে নিজ অস্থিত্ব আল্লাহতে বিলিন করে চিনি-পানি, লোহা-আগুনে, মিশে যাবার মত, তাঁর সহিত মিলিত হয়, তাঁদের স্থান সবার উপরে।

* মহান আল্লাহতে প্রকৃত বিলুপ্তকারী ঐ ব্যক্তি যার "আহার" রোগীদের আহারের মত, যার "শয়ন" সাপের কামড়ে বেহুঁশ লোকের শয়নের মত, জীবন পানিতে ডুবে গেছে এমন ব্যক্তির জীবনের মত।

* নিজের মধ্যে যেসব গুণ নেই, এমন বিষয় সাজিয়ে লোক সমাজে প্রকাশ করে, সে মহান আল্লহার দৃষ্টি হতে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে।

* সৃষ্টির মধ্যে ঐ ব্যক্তিই শক্তিশালী যে ক্রোধকে হজম করে।

* দুনিয়া কসাই খানা, কুকুরদের একত্র হবার স্থান। যে সর্বদা দুনিয়ার ধন উপার্জনে ব্যস্ত সে কুকুর অপেক্ষাও অধম। কারণ কুকুর যখন পেট ভরে আহার করে, তখন কসাই খানা হতে সরে পড়ে, কিন্তু মানুষ যতই "দুনিয়ার" উন্নতি করে, ততই তার প্রতি মগ্ন হয়ে পড়ে।

* যে নিজেকেই চিনে না-সে ধর্মীয় ধোঁকার পতিত হয়।

* যে ব্যক্তি লোকের নিকট পরিচিত হবার জন্য "ইবাদত" করে-সে মুশরিক, আল্লাহ পাকের সহিত সে অংশীবাদী, কেননা "তার ইবাদত" মহান আল্লাহকেও দেখায়, আবার লোকদেরকেও দেখায়।

* "অন্তর" একটি বিশেষ পাত্র; যখন তা মহান আল্লাহর "নূরে" ডুবে যায় তখন তাঁর সমস্ত "শরীর" তাঁর ঐ "নূরেই" ডুবে যায়।

* দুনিয়ার "জ্বালা জঞ্জাল", হতো মুক্ত হতে পারলেই, পূর্ণরূপে "ইবাদতে" স্বাদ পাওয়া যায়।

* পবিত্র কুরআনে আল্লাহর পথ খুবই উজ্জল, সত্যের উজ্জল প্রকাশ। যদি "অন্ধ আত্মার" মানুষ না হোন, তবে আল্লাহ পাকের পথ চিনতে কোনই কষ্ট নেই।

* আপনার নফসে অম্মারা ও লাওয়্যামা মেরে ফেলুন তবেই আপনি "মহান আল্লাহর পথে জিন্দা" হতে পারবেন।

* "দুনিয়ায়" আল্লাহর সৃষ্টিতে বহু নছীহতে আছে, যে তা গ্রহণ করে না, তার জন্য "দুনিয়ায়" একবিন্দুও নছীহত নেই।

* "মহান আল্লাহর প্রিয়গণ" নির্জনতাই ভালবাসেন, মানুষের সহিত প্রচুর মেলামেশাকে ভয় মনে করেন।

* আল্লাহ প্রেমিকদের তিনটি মহৎ গুণ সব সময় বিদ্যমান থাকে। যথাঃ

(ক) সকল বিষয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(খ) সকল বস্তু হতে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা।

(গ) প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ পাকের পক্ষ হতেই হয় বলে মনে করা।

* যদি "মউতকে" বস্তায় ভরে বাজারে বিক্রি করা যেত তবে পরকালের প্রার্থী "নেক বান্দাগণ" এটা ছাড়া আর কিছুই ক্রয় করতো না।

* যার "মন" (আত্মা) মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে খুশী হয়, তার "সব খুশীই" দুঃখ হয়ে যায়। আর যার "মন" মহান আল্লাহর প্রতি ফিরায়, তার "শরীর" সব গুনাহ হতে মুক্তি পায়।

* আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, আমার অদৃষ্টের জিনিস আমিই লাভ করবো। আমি ছাড়া তাতে অন্যের কোন অংশ নেই। সুতরাং আমার রিযিক লাভে আমি কোন রকম চিন্তা ভাবনা ও হা হুতাশ করি না।

* আমি অবগত আছি যে, আমার কাজকর্ম আমাকেই সমাধা করতে হবে। আমি ছাড়া তা অন্য কেউ করবে না। তাই আমার কাজসমুহ করতে আমি অলসতা পছন্দ করি না।

* আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আমি সব সময়ই আল্লাহ পাকের কাছে উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করি। কারণ আমি সবসময় লজ্জিত অবস্থায় মাথা অবনত করে থাকি।

ইবাদত ও যিকিরসমূহের ফলাফল

* হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ "দুনিয়া সৃষ্টির আগে ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একেক জনকে একেক আসমানের দারোয়ান নিযুক্ত করেন।"

অতঃপর হাফেযা নামক ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেন। এ ফেরেশতার দায়িত্ব হলো ঃ দুনিয়া থেকে বান্দাদের ইবাদত ও যিকির যথানিয়মে মহান আল্লাহর কাছে পৌছানো।

* হাফেযা ফেরেশতা বান্দাদের সকল ইবাদতের নেকী নিয়ে প্রথম আসমানে পৌছলে প্রথম আসমানের দারোয়ান বলবেন ঃ মহান আল্লাহ! পর নিন্দাকারী বা বদনামকারীর ইবাদত নেকী বাছাই করে তার মুখ বরাবর নিক্ষেপ করার হুকুম করেছেন । এগুলো নিয়ে এ আসমান পার হওয়ার হুকুম নেই। হাফেযা তাই করবেন।

* অতঃপর বাছাইকৃত (অবশিষ্ট) নেকীগুলো নিয়ে, দ্বিতীয় আসমানে যাবেন। দ্বিতীয় আসমানের দারোয়ানও বলবেন ঃ ধন সম্পত্তি কামাই করার জন্য এবং মানুষের কাছে প্রশংসা পাবার জন্য সকল ইবাদতের নেকী নিয়ে এ আসমান পার হবার অনুমতি মহান আল্লাহ আমাকে দেননি। এ নেকীগুলো ঐ ইবাদতকারীর মুখে নিক্ষেপ করে দিন। "হাফেযা তাই করবেন।"

* তারপর বাছাইকৃত অবশিষ্ট নেকীগুলো নিয়ে তৃতীয় আসমানে গেলে ঐ আসমানের দারোয়ান বলবেন ঃ অহংকারী লোকদের নেকী এ আসমান দিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম আল্লাহ পাক আমাকে দেননি। উহা অহংকারী ইবাদতকারীর মুখে নিক্ষেপ করে অবশিষ্ট নেকী থাকলে উহাই নিয়ে যান। হাফেযা ফেরেশতা ঐ নেকীগুলো অহংকারীর মুখেই নিক্ষেপ করে দিবেন।

* হাফেযা ফেরেশতা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাৎ, যিকির ও দানকারীদের ইবাদতগুলো তারকার মত চমকানো নেকীসমূহ নিয়ে চতুর্থ আমানের দারোয়ানের নিকট গেলে তিনিও বলবেন ঃ "বড়াইকারীদের" নেকী নিয়ে এ আসমান পার হওয়ার অনুমতি আল্লাহ পাক আমাকে দেননি। ঐ নেকীগুলো তাদের মুখে নিক্ষেপ করে দিন।

* ঐ নেকীগুলো নিক্ষেপের পর নববধুর বেশে হাফেযা অবশিষ্ট নেকীগুলো নিয়ে পঞ্চম আসমানের দারোয়ানের নিকট পৌছলে তিনিও বলবেন ঃ মহান আল্লাহ্ ঈর্ষাকাতর, পরশ্রী কাতর, কলহপ্রিয় ও কর্কশভাষীদের নেকী এ আসমানের পথে নিয়ে যাবার অনুমতি আমাকে দেননি। উহা সব তাদের মুখেই নিক্ষেপ করুন।

* বাকী নেকীগুলো নিয়ে হাফেযা ৬ষ্ঠ আসমানের দারোয়ানের নিকট গেলে ঐ দারোয়া বলবেন ঃ নির্মম, নির্দয় ও পরমূখী বান্দাদের ইবাদতের নেকী নিক্ষেপ করে তাদের মুখেই ফেলে দিন। হাফেযা ফেরেশতা তা-ই করবেন।

* সর্বশেষ নেকীগুলো সূর্য্যের মত দীপ্তিমান, প্রখর, তেজতুল্য হবে। ওখানে তিন হাজার ফেরেশতার পাহারায় বজ্র ধ্বনীর মত গর্জন করতে করতে সপ্তম আসমানের দারোয়ানের নিকট উপস্থিত হলে ঐ দারোয়ান বলবেন ঃ মহান আল্লাহ্র অনুমতি নেই যারা মানুষদের দেখানোর জন্য ও নাম জাহেরী করার জন্য ইবাদত করেছে, তাদের নেকী তাদের মুখেই নিক্ষেপ করার পর যা একেবারে ছহীহশুদ্ধ, এসব নেকীসমূহ নিয়ে মহান আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হোন। সোবহানাল্লাহ।

এ সম্মন্ধে মহানবী (সাঃ) আরো বলেছেন ঃ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দেয়া পর্যন্ত কেহই বেহেশতে যেতে পারবে না।

পাঁচটি প্রশ্ন নিম্নরূপ ঃ

(ক) হায়াত সম্পর্কে : সে কোন কাজে জীবন কাটিয়েছে?

(ক) যৌবন সম্পর্কে : সে কি কি কাজে যৌবন কাটিয়েছে?

(গ) ধনসম্পদ সম্পর্কে : সে কি কি উপায়ে ধন সম্পদ অর্জন করেছে?

(ঘ) ব্যয় সম্পর্কে : কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে ?

(ঙ) আ'মল সম্পর্কে : "ইসলামী" জ্ঞান অনুসারে আ'মল করছে কি না?

এতে ত্রুটি হলে তিরস্কার আর ইসলামী অনুসারে হলে পুরুস্কার পাবেন।

এতে বুঝা গেল "জ্ঞান" হাদিস কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বাইরের জ্ঞান "দুনিয়া"। সুতরাং ইসলামী জ্ঞান ছাড়া আ'মল, আর আমল ছাড়া ইসলামী জ্ঞান অর্জন মূল্যহীন।

ছয় লতিফার নক্‌শা
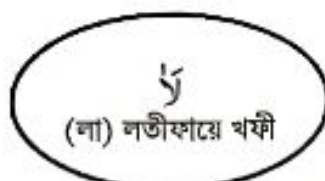
চিশতিয়া তরিকার সমস্ত এবং নক্‌শাবন্দিয়ার অনেক বুজুর্গাণের মত অনুযায়ী লেখা গেল।

এই কালেমার যিকির করার সময় উপরের নকসাটি দেখুন! (لا) লা- নফ্‌স হতে-(اِ) ই সের হতে, (لا) লা খফী হতে, ۿ হা আখ্‌ফা হতে সংযোগ দিয়ে যিকির করতে হয়। এবং (اِلَّا) ইল্লা রূহে ও (اللهُ) আল্লাহ ক্বালবের সহিত সংযোগ দিয়ে চক্ষু বন্ধ করে আল্লাহর প্রতি ভয় ভক্তি নিয়ে ধ্যানের সাথে প্রতিদিন কমপক্ষে একশত বার করে সকাল বিকাল যিকির করলে বহু লাভবান হওয়া যায়।

প্রতিটি লতীফার সীমার মধ্যে যে বর্ণের মহান আল্লাহর "নূর" সমূহ বিদ্যমান রয়েছে – (ইহা পূর্বে উল্লেখিত আছে) সে–ই "নূর" সমূহের (আপন আপন) সীমার মধ্যেই যিকিরের মাধ্যমে (নূরসমূহকে) আয়ত্ব করে নিতে হয়। লক্ষ্যণীয়: সে লতীফা নফসের "নিজস্ব কোন নূর" নেই, উহা অন্ধকার। সুতরাং ইবাদত যিকিরে "ক্বালবের যে নূর" আয়ত্ব হয়, ক্বালবের ঐ নূরসমূহ নফসের যিকিরে পাতালসহ পৃথিবীকে ত্বয় (অতিক্রম) করে "ক্বালব ও নফস" অর্থাৎ এই দু'লতীফার একত্রে-একযোগে যিকির করে ঐ একই "নূরে" নফসের সীমা আলোকিত করতে হয়।

অতঃপর সকল ইবাদত বা যিকিরে ধ্যানের সহিত সব লতীফার "নূর" সমূহ মনে (ক্বাল্‌বে) একত্র করে সারা বিশ্বব্যাপী "মহা নুরময়ে" নিজ "দেহ মনকে" আলোতিক করে ডুবে থাকতে হয়।

অথবা সব লতীফার "নূরসমূহ "সেরে" একত্র করে সারা বিশ্ব ব্যাপী "মহা নূরমাঝে" নিজ দেহ সেরকে আলোকিত করে ডুবে থাকতে হয়। ঐ সময় সাধক নিজেকে চিনতে পেরেই মহান আল্লাহকে চিনে নেয়। তাই মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهٗ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهٗ*

উচ্চারণ ঃ "মান আরফা নাফসাহ্‌ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ্‌।" অর্থাৎ- "যে নিজেকে চিনে সে-ই, আল্লাহকে চিনে।" এবং নিজ অস্তিত্ব এইভাবে আল্লাহতে বিলীন করতঃ ঐ "নূর"সমূহে ডুবে থাকাই আল্লাহর প্রতি মহব্বত, ইবাদত বা "মা'রেফত"। আর ইহাই হলোঃ ইবাদত বা যিকিরের মুখ্য উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট লক্ষ্য।

বার শত বার যিকির করবার নিয়ম

প্রতিদিন নিম্নরূপে নিয়মিত "যিকির" চালু রাখলে মহান আল্লাহর প্রিয় হয়ে তাঁর অসংখ্য নে'আমতের সুফলতা লাভ করা যায়।

প্রথমে আল্লাহ পাককে হাজির জেনে আস্তাগফিরুল্লাহ ও দরূদ শরীফ তিন–তিন বার কালেমা তৈয়্যিবা ও শাহাদাৎ তিন্‌-তিন্‌ বার পড়ে "ছয় লতীফায়" পূর্ববর্ণিত নিয়মে সংযোগ দিয়ে যিকির করতে হবে।

পরে শুধু "লতীফা ক্বালবে" লক্ষ্য করে দু' শত বার লা-ই, লা হা, ইল্লাল্লাহ্‌ পড়তে হয়।

অতঃপর পুনরায় পূর্ব নিয়মে কালেমা তৈয়্যিবা ও শাহাদাৎ তিন তিন বার করে পড়ে নিয়ে শুধু "লতীফা ক্বলবে" লক্ষ্য করে দু'শত বার "ইল্লাল্লাহ" যিকির করতে হবে।

তারপর পুনরায় কালেমা তৈয়্যিবা ও কালেমা শাহাদাৎ পূর্ব নিয়মেই তিন তিন বার করে পড়ে নিয়ে শুধু "লতীফা ক্বালবেই" সংযোগ দিয়ে ছয় শত বার "আল্লাহ্ আল্লাহ্" পড়তে হয়।

সর্বমোট এইভাবে বার শত বার শুধুমাত্র ক্বালবের লক্ষ্যে যিকির করা পুরা হলে পরো, একশত বার চুপে চুপে "প্রত্যেক লতীফ" সমান সমান ভাগে অর্থাৎ প্রত্যেক লতীফার অন্তত ঃ ২০ বার করে "আল্লাহ" যিকির করতে হয়।

অতঃপর আস্তাগফিরুল্লাহ ও দরূদ শরীফ তিন – তিন বার করে পড়ে নিয়ে মুনাজাত করতঃ এ "যিকির" শেষ করতে হয়।

শ্বাস প্রশ্বাসের যিকির

এ যিকির দু'রকমে করা যায় ঃ

(১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "লা-ই, লা-হা, ইল্লাল্লাহ।"

(২) اَللّٰهُ "আল্লাহ্"।

প্রথম যিকিরটি করতে চাইলে নিশ্বাস বাইরে নিতে "লা ইল্লাহা" এবং নিশ্বাস ভিতরে নিতে "ইল্লাল্লাহ" যিকির করতে হয় একশতবার। আর দ্বিতীয় যিকিরটি করতে চাইলে "আল্লাহ্" নিশ্বাস ভিতরের দিকে টেনে আনতে হয় এবং "হু" নিশ্বাস বাইরের দিকে নিতে হয়। এই ভাবে একশত বার।

অথবা এ যিকির দু'টি যে যতবার ইচ্ছা করতে পারেন। অজু, বেঅজুতেও এ যিকির করা নিষেধ নেই। চলাফেরায়, উঠা নামায়, কাজে কর্মে, শুয়ে শুয়েও এ যিকির দু'টি করা যায়। যিকির করতে করতে নিদ্রায় গেলেও, ফেরেশতারা নেকী লিখতে থাকবেন। এ যিকির দু'টি সব সময় চালু থাকলে "আত্মা" ছাফাই হবে। মনে বা"আত্মায়" সব সময় শান্তি আসবে। ইনশা আল্লাহ।

সকাল-সন্ধার আমলসমূহ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ *

(১) উচ্চারণ ঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যান্বিও ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওলা ক্কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল আ'লীয়্যিল আ'জীম।" তিনবার পড়তে হয়।

ফজিলত ঃ ইহা ফজরের সুন্নাতের পর পর একশতবার পড়লে গোনাহ্ মা'ফ হয় এবং আগুন যেরূপ বাকলকে পুড়ে ছাই করে ফেলে, তদ্রূপ এই আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করলে গুনাহসমূহ ঐরূপ ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর আত্মার আশন্তি দূরীভূত হয়ে শান্তি স্থাপিত হয়।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْبَرَاى وَالْوَرَاى وَالثَّرَاى وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ

(২) উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মোহাম্মাদিম বিআদাদিল্ বারা, ওয়াল্ ওয়ারা, ওয়াছ্ছারা, ওয়া আলিহি, ওয়া সাল্লামা।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ এই দরূদ শরীফটি হাজী, শহীদ, আমিরুল মু'মেনীন ও মোহাম্মাদিয়ার ঈমাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর (র) নিকট হতে রপ্তাবরপ্তা পাওয়া গেছে। ইহার বহু ফজিলত বর্ণিত রয়েছে।

যাঁরা হযরত রাসুলে পাক (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে চান, তাঁরা পরিস্কার কাপড় পরিধান করতঃ আতর কিংবা সুগন্ধ জাত দ্রব্য ব্যবহার করে পবিত্র স্থানে মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি দিবাগত রাত্রে এক হাজার বার পড়লে আল্লাহর ফজলে মাকছাদ হাছেল হবে। এই আ'মলে হযরতের সহিত স্বপ্নে মোলাকাৎ হবে। অনধিক তিন সপ্তাহের বেশী প্রয়োজন হবে না। ইনশাআল্লাহ!

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللهَ

(৩) উচ্চারণ ঃ "সোব্হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সোবহানাল্লাহিল আ'জীম্ ওআ বিহামদিহী আস্তাগফিরুল্লাহ॥" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ উল্লিখিত তাসবীহ্ প্রত্যেহ ফজরের সুন্নাত ও ফরজের মধ্য খানে একশতবার পড়লে রোজগার বৃদ্ধি হবে, গরীবি থাকবে না। আর আজিফার নিয়মে তিনবার পড়লে বহু সওয়াব হবে।

سُبْحَانَ الْقَدِيْمِ الَّذِىْ لَمْ يَزَلْ. سُبْحَانَ الْعَلِيْمِ الَّذِىْ لَا يَجْهَلْ.

سُبْحَانَ الْجَوَادِ الَّذِىْ لَا يَبْخَلْ. سُبْحَانَ الْحَلِيْمِ الَّذِىْ لَا يَعْجَلْ *

উচ্চারণ ঃ "সোব্হানাল্ ক্কাদিমিল্ লাযী- লাম ইয়াযাল্ সোব্হানাল্ আ'লীমিল্ লাযী লা ইয়াজ্হাল্ সোবহানাল্ জাওয়াদিল্ লাযী লা ইয়াবখাল্-সোবহানাল্ হালিমিল্ লাযী লা ই'য়াজাল্।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ এ তসবীহ্ যে ব্যক্তি প্রত্যহ আ'মলে রাখবে, তাঁর নাম আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ*

(৫) উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আ'ন্ হারামিকা ওয়া আগ্নিনী বিফাদ্লিকা আ'ম্মান্ সিওয়াকা।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ এ দোয়াটি যে প্রত্যহ আমল করবে মহান আল্লাহ্ তাকে ঋণ মুক্ত করবেন।

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَا قِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْ نَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ*

(৬) উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা আহ্সিন্ আ'কিবাতানা ফীল্ উমুরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন্ খিজয়িদ্ দুনইয়া ওয়া আজাবিল্ আখিরা।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ "যে প্রত্যহ এর আ'মল করবে দুনিয়া ও পরকালের অশান্তি , অপমান হতে আল্লাহ্ পাক তাকে রক্ষা করবেন।"

اَللّٰهُمَّ خَلِّصْنَا مِنْ عَذَابِ الدَّيْنِ بِحَقِّ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ

(৭) উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা খাল্লিছ্না মিন্ আযাবিদ্ দায়নী বিহাক্কে জাদ্দিল হাসানে ওয়াল্ হুসাইনে।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ এই দোয়াটি আ'মল করলে ঋনের মছিবত হতে সে উদ্ধার পাবে।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ*

(৮) উচ্চারণ ঃ "হাসবুনাল্লাহ্ ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল্ নিমাল্ মাওলা ওয়া নি'মান্ নাছীর।" তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ এ দোয়াটি প্রতিদিন আ'মল করলে দুনিয়া ও পরকালের সব কাজ মহান আল্লাহ্ সমাধান করে দিবেন।

حَسْبِىْ رَبِّىْ جَلَّ اللّٰهُ مَا فِىْ قَلْبِىْ غَيْرُاللّٰه . نُوْرُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه . لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه .

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

(৯) উচ্চারণ ঃ হাস্‌বী রাব্বী জাল্লাল্লাহ্ মাফী ক্বাল্‌বী গাইরুল্লাহ নূরু মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহ্ -লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ, লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ -লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ- লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ -লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ । তিনবার ঃ

ফজিলত ঃ ইহা নফী এছবাতের নিয়মে পড়লে, যে কোন আসমান জমিনী বালা মছিবত হতে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা উদ্ধার করবেন।

لَا خَالِقَ اِلَّا اللهُ. لَا مَالِكَ اِلَّا اللهُ *

(১০) উচ্চারণ ঃ "লা খালিকা ইল্লাল্লাহ লা মালিকা ইল্লাল্লাহ।" তিনবারঃ

لَا خَالِقَ اِلَّا اللهُ . لَا رَازِقَ اِلَّا اللهُ*

উচ্চারণ ঃ "লা-খালিকা ইল্লাল্লাহ লা রাজিকা ইল্লাল্লাহ।" তিনবার ঃ

لَا مَعْبُوْدَ اِلَّا اللهُ . لَا مَحْبُوْبَ اِلَّا اللهُ *

উচ্চারণ ঃ "লা মা'বুদা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ।" তিনবার ঃ

لَا مَطْلُوْبَ اِلَّا اللهُ . لَا مَقْصُوْدَ اِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ "লা মাত্বলুবা ইল্লাল্লাহ লা মাকছুদা ইল্লাল্লাহ।" তিনবার ঃ

لَا شَافِيَ اِلَّا اللهُ. لَا كَافِيَ اِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ "লা শাফিয়া ইল্লাল্লাহ্ লা কাফিয়া ইল্লাল্লাহ।" তিনবার ঃ

لَا دَافِعَ اِلَّا اللهُ . لَا رَافِعَ اِلَّا اللهُ

উচ্চারণ ঃ "লা দাফিয়া ইল্লাল্লাহ, লা রাফিয়া ইল্লাল্লাহ।" তিনবার ঃ

اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ . اِلَّا اللهُ

اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ

উচ্চারণ ঃ "ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ্ ইল্লাল্লাহ" "আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্।"

اَنْتَ الْهَادِىْ اَنْتَ الْحَقُّ لَيْسَ الْهَادِىْ اِلَّا هُوَ *

(১১) উচ্চারণ "আনতাল্ হাদী আনতাল্ হাক্ক লাইসাল্ হাদী ইল্লাহু।" তিনবার ঃ

اَنْتَ الشَّافِيْ اَنْتَ الْحَقُّ . لَيْسَ الشَّافِيْ اِلَّا هُوَ *

উচ্চারণ ঃ "আন্তাশ্ শাফী আন্তান্ হাক্ক লাইসাশ্ শাফী ইল্লাহু।" তিনবারঃ

ـ اَنْتَ الْبَاقِيْ اَنْتَ الْحَقُّ لَيْسَ الْبَاقِيْ اِلَّا هُوَ

উচ্চারণ ঃ "আন্তাল বাকী আন্তাল হাক্ক, লাইসাল বাকী ইল্লাহু।" তিনবারঃ

اِلَّا هُوَ اِلَّا هُوَ اِلَّا هُوَ *

উচ্চারণ ঃ "ইল্লাহু ইল্লাহু ইল্লাহু।" তিনবার ঃ

اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্।" তিনবার ঃ

اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ . اَللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, সাতবারঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ الْبَرَاى وَالْوَرَاى وَالثَّرَاى وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআ'দাদিল্ বারা, ওয়াল্ ওয়ারা ওয়াছ্ছারা ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম।" তিনবার ঃ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ *

উচ্চারণ ঃ "আস্তাগফিরুল্লাহা রাববী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্কুওয়্যাতা, ইল্লা বিল্লাহিল আ'লীয়্যিল আ'জীম্।" তিনবারঃ

সায়্যিদুল ইস্তেগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ. وَاَنَا عَبْدُكَ. وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ. اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ই-লাহা ইল্লা আন্তা খালাক্কতানী ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আ'লা আ'হ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'য়তু আয়ুযুবিকা মিন শাররী মা ছানা'তু। আবুয়ু লাকা বিনিয়মাতিকা আ'লাইয়্যা ওয়া আবুয়ু' বিযাম্বি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ ফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আন্তা। একবার ঃ

ফাদ্‌লে ছে দিদার্ খুদা মুজকু মিলাদে!
লুৎফে ছে দিদার তেরা হাম্‌কো দিলাদে! (তিনবার)

অর্থাৎ ওহে আল্লাহ্ পাক! অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে দেখা দিন! এবং আপনার করুণায় আমাদের সকলকেই দেখা দিন! যেন আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাতের সুব্যবস্থা হয়।

ফজিলত ঃ যে ব্যক্তি সায়্যেদুল ইস্তেগফার সকালে এক বার পড়বে, সেদিনের সন্ধার মধ্যে, আর সন্ধার সময় একবার পড়লে রাত্রি প্রভাত অর্থাৎ, সকালের মধ্যে মৃত্যু ঘটলে আল্লাহ্ পাক, এই মহা বুজর্গতম ইস্তেগফারের বরকতে তার গোনহ মা'ফ করে দিবেন। হাদিস শরীফে এই ফজিলত বর্ণিত রয়েছে।

রাতে শুইবার সময় দোয়া

নিম্নের দোয়াটি শুইবার সময় পাঠ করে শুইলে, যদি রাত শেষ হবার আগে কেউ মারা যায় মহান আল্লাহ্ তাঁকে মা'ফ করে বেহেশতেও দিতে পারেন। হাদিসে ইহাও উল্লেখিত রয়েছে। দোয়াটি এই ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ. وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ. وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ. رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ اِلَّا اِلَيْكَ. اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা আস্‌লামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হীয়া ইলাইকা ওয়া ফাঁওয়্যাদতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজায়াতু জাহরী ইলাইকা রাগবাতাওঁ ওয়া রাহ্‌বাতান্ ইলাইকা লা মাল্‌জাআ ওয়ালা মান্‌জাআ মিন্‌কা ইল্লা ইলাইকা, আমান্তু বিকিতাবিকাল লাযী আনযালতা ওয়া নাবীয়্যিকাল লাযী আরসালতা।"

অজিফা ও যিকির শেষ হবার পর মুনাজাত

(১) মুনাজাত ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عُيُوْبَنَا. اَللّٰهُمَّ اقْضِ دُيُوْنَنَا وَاَصْلِحْ اَحْوَالَنَا وَبَلِّغْ اٰمَالَنَا وَتَقَبَّلْ اَعْمَالَنَا وَهَبْ لَنَا مُلْكًا طَيِّبًا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ . اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ . اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ صُدُوْرَنَا بِصَفَاءِ مَعْرِفَتِكَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ যুনুবানা আল্লাহুম্মাছ্ তুর্ উয়ুবানা আল্লাহুম্মাকদে দুইউনানা ওয় আছলিহ্ আহওয়ালানা ওয়া বাল্লিগ আমালানা ওয়া তাকাব্বাল আ'মালানা ওয়া হাব্লানা মুল্কান্ ত্বায়্যেবাম মিন্ খাজায়িনে রাহ্ মাতিকা, আল্লাহুম্মা নাব্বির্ ক্বুলুবানা বিনুরে মা'রেফাতিকা আল্লাহুম্মাশ্ রাহ্ ছুদুরানা বিছাফায়ি মা'রেফাতিকা ওয়ার হাম্না বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্ হামার্ রাহিমিন।

(২) মুনাজাত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ . وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ . وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنٰى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিন্নারে ওয়া আযাবিন্নারে ওয়া ফিত্নাতিল্ ক্বাবরে ওয়া আযাবিল্ ক্বাবরে ওয়া শার্রি ফিতনাতিল্ গীনা ওয়া শার্রী ফিত্নাতিল্ ফাক্‌রে, আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন্ শার্রী ফিত্নাতিল্ মাসিহিদ্ দাজ্জাল্।

(৩) মুনাজাত ঃ

* اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِىْ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ . وَبَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আগসিল্ ক্বাল্বী বিমায়ীছ্ ছালাজে ওয়াল্ বারাদে ওয়া নাক্বি ক্বালবী মিনাল্ খাতাঈ কামা নাক্বাইতাহু ছাওবাল্ আবয়াদা মিনাদ্দানাস্ ওয়া বায়্যিদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়া কামা বাআদ্‌তা বাইনাল্ মাশ্‌রিকি ওয়াল্ মাগরীব আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল্ কাসালে ওয়াল্ মাআছামে ওয়াল্ মাগরামে।

(৪) মুনাজাত ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিনাল হাম্মি, ওয়াল্ হুজনি, ওয়াল আ'জজি ওয়াল্ কাসালে ওয়াল্ জুবনি ওয়াল্ বুখলি, ওয়া দালায়ি'দ্দাইনি, ওয়া গালাবাতির রিজাল্।"

ফজিলত ঃ উপরোক্ত অজিফা যিকিরসমূহ প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করত ঃ এই নিয়ম মত চল্লিশ দিন আ'মল করলে মহান আল্লাহ অসীম ফল দান্ করবেন বলে বিশ্বাস পূর্বক নিশ্চিন্ত থাকা যায়। এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। দোয়াগুলো বর্ণিত ছহীহ্ হাদিস হতে লিখিত হলো।

ছালাতুল্ আ'শেকীন

ফজর ও মাগরিব নামাজের পর এই ছালাতুল আ'শেকীন দৈনিক দু'বার কমপক্ষে একবার বা যে কোন সময় মত বিশুদ্ধ নিয়তে সুমধুর স্বরে, ভাবাবেশে মত্ত হয়ে পড়বেন যদ্বারা এই বুঝা যায় যে, উহা হযরতে রাসুলে করিম (সাঃ) কে শুনাইতেছেন। এতে আল্লাহ পাকের তরফ হতে অসীম নে'য়ামত হাছিল হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি আছ্‌ছালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহি।"

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ . اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি আছ্ ছালাতু ওয়াস্‌সালামু আ'লাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহি।"

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ . اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু আ'লাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহী।"

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اللهُ . يَا اللهُ . يَا اللهُ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা ত্বাহহির ক্বালবী আন্ গাইরীকা ওয়ানাব্বীর ক্বালবী বিনূরে মা'রেফাতিকা আবাদান ইয়া আল্লাহ্ ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ।"

তিনবার ঃ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ اَنْ تُحْيِيَ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اللهُ . يَا اللهُ . يَا اللهُ *

উচ্চারণ ঃ "ইয়া হাইয়্যো ইয়া ক্বাইয়্যুমু লা ই-লাহা ইল্লা আন্তা, আস আ'লুকা আন, তুহইয়্যা ক্বালবী, বিনুরে মা'রেফাতিকা আবদান্ ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ।"

যিকিরে দো-আলেফী

اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ . اَللهُ .

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্। একশত বার করতে হয়।

এ যিকির দু'প্রকারে আ'মল করা যায় ঃ

(১) চক্ষু বন্ধ করে "আল্লাহ" শব্দটি ক্বলব হতে বাহির করত ঃ ডান মোড়ার উপরে রাখতে হয়। তৎপর "আল্লাহ শব্দটি ডান মোড়া হতে ক্বালবের উপর রাখতে হয়।

(২) চক্ষু বন্ধ করে লতীফা নাফস অর্থাৎ নাভী হতে আল্লাহ্ শব্দ আরম্ভ করে মুখের সম্মূখে রাখতে হয়। অতঃপর মুখ হতে আরম্ভ করে "আল্লাহ" শব্দটি লতীফায় আখফায় অর্থাৎ মাথার তালুর উপর রাখতে হয়।

এই দু'প্রকারের যে কোন একটিকে কম পক্ষে একশত বার আ'মল করতে হয়। তৎপর এসমে জাত "আল্লাহ" নাম, একশত বার আ'মল করতে হয়। এবং ছয় লতীফা ও সর্ব শরীরে কিছুক্ষণ ধ্যান বা খিয়াল করে নিম্ন যিকিরটি তিনবার করতে হয়।

اِلٰهِىْ اَنْتَ مَقْصُوْدِىْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِىْ

উচ্চারণ ঃ "ইলাহী আন্তা মাক্ছুদী ওয়া রিদাকা মাত্বলুবী।"

তিনবার ঃ

صَلُّوْا عَلٰى اَحْمَدْ نَبِيِّنَا * شَافِعٌ فِيْكُمْ وَ فِيْنَا * يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِنَا * مَرْحَبًا. مَرْحَبًا يَا رَسُوْلَ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ "ছাল্লু আ'লা আহমাদ নাবীনা, শাফীউম্ ফীকুম্ ওয়াফীনা ইয়া রাব্বী ছাল্লি ওয়া সাল্লিম আ'লা রাসুলীনা মারহাবা মারহাবা ইয়া রাসুলাল্লাহ।" দু'বার ঃ

অতঃপর পড়তে হয়,

يَا نَبِيَّ الْمُصْطَفٰى شَانُكُمْ صَلُّوْا عَلَيْهِ * يَارَسُوْلَ الْمُجْتَبٰى شَانُكُمْ صَلُّوْا عَلَيْهِ * يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ شَانُكُمْ صَلُّوْا عَلَيْه * يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ شَانُكُمْ صَلُّوْا عَلَيْهِ * مَنْ يَّمُتْ فِىْ حُبِّكَ حُبُّكَ حُبُّ الْاِلٰهِ _ قَدْ يَصِلُ بِالْمُدَّعٰى شَانُكُم صَلُّوْا عَلَيْه. اَلصَّلٰوةُ عَلَى النَّبِىِّ وَالسَّلَامُ وَعَلَى الرَّسُوْلِ. اَلشَّافِعُ الْاَبْطَحِىْ وَ مُحَمَّدْ عَرَبِىْ يَا مُحَمَّدْ عَرَبِىْ *

صَلِّ وَسَلِّمْ يَا اللهُ . صَلِّ وَسَلِّمْ يَا اللهُ صَلِّ وَسَلِّمْ يَا اللهُ عَلٰى مُحَمَّدْ نُوْرِ اللهِ عَلٰى مُحَمَّدْ نُوْرِ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ "ইয়া নাবীয়াল্ মোছত্বাফা শানুকুম ছাল্লু আলাইহি ইয়া রাসুলাল মোজতাবা শানুকুম ছাল্লু আলাইহি ইয়া শাফীআ'ল্ মুয্নাবীন্ শানুকুম্ ছাল্লু আলাইহি ইয়া রাহ্মাতাল্ লিল্ আ'লামীন্ শানুকুম্ ছাল্লু আ'লাইহি মাঁইয়ামুত্ ফী হুব্বিকা, হুব্বুকা হুব্বুল্ ইলাহ্ ক্বাদ ইয়াছিল্ বিল্ মুদ্দাআ' শানুকুম্ ছাল্লু আ'লাইহি আছ্ ছলাতু আ'লান নাবী ওয়াস সালামু আ'লার রাসুল আশ শাফিউল আবত্বহী ওয়া মুহাম্মদ আ'রাবী ইয়া মুহাম্মদ আ'রাবী।

ছাল্লি ওয়া সাল্লিম ইয়া "আল্লাহ", ছাল্লি ও সাল্লিম ইয়া "আল্লাহ" ছাল্লি ওয়া সাল্লিম ইয়া "আল্লাহ" আ'লা মুহাম্মদ্ নূরীল্লাহ আ'লা মুহাম্মাদ নূরীল্লাহ।"

حَسْبِیْ رَبِّیْ جَلَّ اللهُ. مَا فِیْ قَلْبِیْ غَيْرُاللهِ نُوْرُ مُحَمَّدْ صَلَّى اللهُ لَاإِلٰهَ إِلَّا

اللهُ. لَاإِلٰهَ إِلَّااللهُ. لَا إِلٰهَ اِلَّااللهُ*

উচ্চারণ ঃ "হাস্‌বী রাব্বী জাল্লাল্লাহ্, মা ফী ক্বাল্‌বী গাইরুল্লাহ্, নূর মুহাম্মাদ্ ছাল্লাল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" তিনবার ঃ

এ স্থলে নফী এছবাতের যিকিরকে ছয় লতীফার সহিত মিলাইয়া একশতবার আ'মল করতে হয়।

মুনাজাতের পূর্বে এই দরূদ শরীফটি পাঠ করা অতি উত্তম।

صَلٰوةُ اللهِ سَلَامُ اللهِ عَلٰى رُوْحِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ هَدَانَا

اِلٰى صَوَابِ اللهِ*

উচ্চারণ ঃ "ছালাতুল্লাহ্ – সালামুল্লাহ্ – আ'লা রুহি রাসুলিল্লাহ্– মুহাম্মদু খাইরু খালক্বিল্লাহ্ – হাদানা ইলা ছাওয়াবিল্লাহ।"

صَلٰوةُ اللهِ سَلَامُ اللهِ عَلٰى رُوْحِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ هَدَانَا

اِلٰى سَبِيْلِ اللهِ*

উচ্চারণ ঃ ছালাতুল্লাহ – সালামুল্লাহ – আ'লা রূহে রাসুলিল্লাহ্ মুহাম্মাদ খাইরু খালক্বিল্লাহ্ হাদানা ইলা সাবিলিল্লাহ।"

صَلٰوةُ اللهِ سَلَامُ اللهِ عَلٰى رُوْحِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ هَدَانَا

اِلٰى فَنَا فِى اللهِ*

উচ্চারণ ঃ "ছালাতুল্লাহ্–সালামুল্লাহ্ আ'লা রুহে রাসুলিল্লাহ্ মুহাম্মাদুন খাইরু খাল্‌ক্বিল্লাহ্ হাদানা ইলা ফানাফিল্লাহ।"

صَلٰوةُ اللهِ سَلَامُ اللهِ عَلٰى رُوْحِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدُ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ هَدَانَا

اِلٰى بَقَا بِاللهِ*

উচ্চারণ ঃ "ছালাতুল্লাহ্ সালামুল্লাহ্ আ'লা রূহে রাসুলিল্লাহ্ মুহাম্মাদুন খাইরু খালক্বিল্লাহ্ হাদানা ইলা বাক্বাবিল্লাহ।"

صَلوٰةُ اللهِ سَلَامُ اللهِ عَلٰى رُوْحِ رَسُوْلِ اللهِ مُحَمَّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ هَدَانَا

اِلٰى لِقَاءِ اللهِ *

উচ্চারণ ঃ ছালাতুল্লাহ্ সালামুল্লাহ আ'লা রুহি রাসুলিল্লাহ্ মুহাম্মাদ খাইরু খাল্‌ক্বিল্লাহ্ হাদানা ইলা লিক্বাইল্লাহ্।"

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ. فَرِّجْ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَرِّجْ

عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ بِالنَّبِىِّ طه الْاَمِيْنِ بِالنَّبِىِّ طه الْاَمِيْنِ وَبِاُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبِاُمِّ

الْمُؤْمِنِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ "ইয়া আরহামার রাহিমিনা ইয়া আরহামার রাহিমিনা ফাররিজ আ'লাল্ মুসলিমিনা ফার্‌রিজ আলাল্ মুসলিমিন। বিন্নাবী ত্বাহাল্ আমিন্ বিন্নাবী ত্বাহাল্ আমিন ওয়াবি উম্মিল্ মু'মিনিন ওয়াবি উম্মিল মু'মিনিন।"

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ "সোবহানা রাব্বীকা রাববীল্ ইজ্জাতি আ'ম্মা ইয়াছিফুন ওয়া সালামুন্ আ'লাল্ মুরসালিনা ওয়াল্ হামদু লিল্লাহি রাব্বীল্ আ'লামিন।"

সূরা ফাতিহা শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে।

অতঃপর নিম্ন মুনাজাতে যিকিরে দো আলেফী শেষ করতে হয়।

মুনাজাত ঃ

اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ الصَّلٰوتَ وَالسَّلَامَ اِلٰى رُوْحِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ

هَدِيَّةً وَّتُحْفَةً مِّنَّا *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মা বাল্লিগ্ আছ্‌ছালাতা ওয়াস্ সালামা ইলা রুহিন্নাবিয়্যি ছাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম্ হাদইয়াতাঁও ওয়া তুহফাতাম্ মিন্না।"

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ تَوَالِدَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا وَاغْفِرْ لِاُسْتَاذِىَّ وَلِمَشَائِخِىْ وَلِاَحْبَابِىْ وَلِاَصْحَابِىْ وَلِعَشِيْرَتِىْ وَلِقَبَائِلِىْ وَلِمُوَلِّفِهٖ وَلِمَنْ لَهٗ حَقٌّ عَلَىَّ وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ مُّجِيْبٌ قَرِيْبُ الدَّعْوَاتِ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহুম্মাগ ফির্লী ওয়ালি ওয়ালি দাইয়্যা ওয়লিমান তাওয়ালিদা ওয়ারহাম্ হুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছগিরা, ওয়াগ্ ফির্ লিউস্তাযিয়্যা ওয়ালি মাশায়িখী ওয়ালি আহ্বাবী ওয়ালি আছ্হাবী ওয়ালি আশিরাতি ওয়ালি ক্বাবাইলী ওয়ালি মুয়াল্লিফিহি ওয়ালিমান লাহু হাক্কুন আলাইয়্যা ওয়ালি জামিয়্যি'ল মু'মিনিনা ওয়াল্ মু'মিনাতি ওয়াল মুসলিমিনা ওয়াল্ মুসলিমাতি ওয়াল্ আহ্ ইয়ায়ি মিন্হুম ওয়াল্ আম্ওয়াতি ইন্নাকা সামিউম্ মুজিবুন্ কারিবুদ্দাওয়াতি।"

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালাতান্ তুনজ্জি'না বিহা মিন জামিয়িল আহ্ওয়ালি ওয়াল্ আফাত ওয়া তাক্বদি লানা বিহা জামিয়িল হাজাত ওয়াতুতাহ্হিরুনা বিহা মিন জামিয়িস সায়্যিআত ওয়া তার্ফয়ূনা ইন্দাকা আ'লাদ্ দারাজাত ওয়া তুবাল্লিগ্না বিহা আক্বছাল্ গায়াত মিন্ জামিয়িল খাইরাতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল মামাত ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদির।

মুরাকাবা

রাতে অবসরকালে বাইরের চোখ বন্ধ করে অন্তর চক্ষু খুলে পরম করুনাময় আল্লাহর প্রেম মহব্বতে আন্তরাত্মায় তাঁর (আল্লাহর) "মহানূর" সমুহ দেখে আয়ত্ত্ব করত ঃ আল্লাহতে ডুবে থাকাই মুরাকাবার মুখ্য উদ্দেশ্য।

বান্দা (সাধক) তখন অন্তর চোখসমূহে' বিশ্ব ব্যাপী "নূরময়" হয়ে নিজেকে চিনেই মহান আল্লাহ্‌কে চিনে নিতে পারেন। সাধক এমন অবস্থার উন্নতি হলে প্রতি একমূহুর্ত কাল আল্লাহর ভয় ভক্তিতে ধ্যানে বসে থাকা হযরত সুলাইমান (আঃ) এর সারা পৃথিবীর বাদ্‌শাহীর চেয়েও উত্তম। এমন জ্ঞানার্জনের সাথে সাথে জ্ঞান দ্বারা চিন্তা ও গভীরভাবে সাধনা করা প্রত্যেকের দরকার আছে। ইহা জ্ঞানের যাকাৎ। এ জন্যই মহা নবী (সাঃ) সারা জীবন গভীরভাবে চিন্তায় মশগুল থাকতে। চিন্তা দূরদর্শীতা ছাড়া মানুষের সুষ্ঠ বুঝ্ ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে না। এ বিষয়ে নবীয়ে করিম (সাঃ) বলেছেন ঃ

تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً*

উচ্চারণ ঃ "তাফক্কারু সা'আতিন খাইরুম্ মিন ইবাদাতে সিত্তিনা সানাতান।"

অর্থ (আল্লাহর প্রতি মহব্বত নিয়ে) "এক ঘন্টাকাল এরূপে চিন্তা গবেষনা করা ষাট বসর নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।"

মুরাকাবা পাঁচ প্রকারে করা যায়

প্রথম মুরাকাবা ঃ

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

উচ্চারণ ঃ "আলামইয়ালাম বিআন্নাল ল্লাহা ইয়ারা। (সূরা আলাক্ব)

অর্থাৎ সে কি জানে না যে, মহান আল্লাহ্ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন? এখানে মধ্যম পুরুষের ছিগায় খেয়াল করতে হবে যে, "হে বান্দা" তুমি কি জান না যে, আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি? আল্লাহ্ পাককে সব সময় অন্তরাত্মায় খিয়ালের মধ্যে রাখতে হবে। এবং সবসময় আল্লাহ হাজির আছেন মনে করতে হবে (তখন এই আয়াত আর মুখে উচ্চারণের বিশেষ দরকার নেই) শুধু অন্তরাত্মায় মহান আল্লাহকে খিয়াল্ করতে হয় এবং ছয় লতীফায় আল্লাহর "নূর" সমূহে ডুবে থাকার চিন্তায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে মহব্বৎ করে তাঁকে চিনে নিবার চেষ্টা করতে হয়। এরপর লক্ষণীয় যে, প্রথম এই মুরাকাবাটি পরপর কয়েকদিন কয়েকবারের চেষ্টা সাধনায় আয়ত্ব করে দ্বিতীয় মুরাকাবাটি শুরু করতে হবে এবং এই একই নিয়মে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মুরাকাবাও আয়ত্ব করতে হবে । এভাবেই মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভে অগ্রসর হতে হয়। তাতে বাদ দেয়া যাবে না। কারণ পানির স্রোত বন্ধ হলে পানিতে শ্যাওলা ধরে।

দ্বিতীয় মুরাকাবা ঃ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ*

উচ্চারণ ঃ "ফাআইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজ্ হুল্লাহ।"

(সূরা বাকারা, ১৪ রুকু)

যখন এই মুরাকাবা করতে হয় তখন খেয়াল করতে হবে যে, আল্লাহ পাক আমার সামনে থেকে বলতেছেন "হে আমার বান্দা" তোমার মুখ যেদিকেই ফিরাও না কেন, সেদিকেই আমার কুদরতী চেহারা দেখতে পাবে।"

আর যখনই তুমি আত্মিক খেয়ালে তোমার নজর আমার দিকে ফিরাবে, তখনি তোমার সামনে আমাকে দেখতে পাবে। তখন যা দেখতে পাবেন তা মহান আল্লাহর "মহা নূর"। আর তাতেই ডুবন্ত হয়ে থাকবেন।

তৃতীয় মুরাকাবা ঃ

করুণাময় আল্লাহ বলেন ঃ

أَنَا مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ*

উচ্চারণ ঃ "আনা মা'আকুম আইনামা কুন্তুম ।" (সূরা হাদিদ, ১ম রুকু)

তিলাওয়াতের সময় গাইর হাজির ছিগায় অর্থাৎ "ওয়াহুয়া মা'য়কুম" পাঠ করতে হবে। কিন্তু মুরাকাবায় মহান আল্লাহকে উপস্থিত মনে করে এ খেয়াল করতে হবে যে, আল্লাহ পাক আপনাকে বলতেছেন ঃ "হে আমার বান্দা"! তুমি যেখানেই থাক না কেন? আমি তো তোমার সাথে মিশেই আছি, তুমি কোথায় পৃথক হয়ে আছ? তোমার মন কেন এদিক সেদিক ঘুরাচ্ছ ? এ সময় মন ঠিক করে মুরাকাবা করতে হয়।

চতুর্থ মুরাকাবা ঃ ইহা কোন আয়াতের মুরাকাবা নয়। দুনিয়াদারী সব রকম খেয়াল মহব্বত, বাদ দিয়ে দিলকে আল্লাহর মহব্বতে শক্ত করে বসিয়ে দিবেন। শুধু সাধনার মাধ্যমে এই মুরাকাবা আদায় করতে হয়। এই মুরাকাবায় খেয়াল করতে হয় যে, আমার ডাইনে বামে, উপরে নিচে, সমস্ত আসমান জমিন, মহান আল্লাহর "নূরের" মহাসাগরে ভর্তি। আমি আল্লাহর মহা নূরের মধ্যে ডুবে আছি।

অতঃপর এই লক্ষ্যে মাথা নিচের দিকে ঝুঁকিয়ে লম্বা করে শ্বাস নিতে নিতে মাথা উপরে উঠাতে হয়। মাথা উঠানোর পর শ্বাস নিচের দিকে সমস্ত শরীরে ছেড়ে দিতে হয়। লক্ষ্য করতে হয় যে, শ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ্ শব্দ টেনে নিয়ে আল্লাহ্ পাকের "নূর" দ্বারা আমার লতীফাসমূহ সহ সমস্ত শরীর ডেকে নিয়ে নূরে পরিপূর্ণ করতেছি "নূর" ছিটাইতেছি। মনে মনে ভাবতে হয়, ওহে আমার "মা'বুদ" আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আমি যেন আপনার ঐ পবিত্র নূরে সর্বদাই ডুবে থাকতে পারি। এই একইভাবে যত বেশী সময় সম্ভব হয়, খিয়ালের মধ্যেই থাকতে চেষ্টা করতে হয়।

পঞ্চম মুরাকাবা ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ "ওয়াফী আনফুসিকুম্ আফালা তুব্‌ছিরুন।"

(সূরা জারিয়াত ঃ ২১ আয়াত)

অন্তরাত্মায় খিয়াল করতে হয় যে, মহান আল্লাহ্ বলতেছেন ঃ "হে আমার বান্দা!" আমি তো– তোমার সীনার মধ্যেই আছি তবে কি তুমি আমাকে দেখ না? এ মুরাকাবা আদায়কারী আল্লাহ্ পাকের "ওলী" হয়ে হাশরের ময়দানে "ওলীদের" দলভূক্ত হতে পারেন। তবে কোন পাপের কাজ করা যাবে না এবং কোন নফল, সুন্নাত ও মুস্তহাবও যেন বাদ দেয়া না হয়।

মুশাহাদা এগারো প্রকারে করা যায়

হাদিসে কুদ্‌সীতে আছে মহানবী (সাঃ)-কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ *

উচ্চারণ ঃ " কুন্তু কান্‌জান্ মাখ্‌ফীআন্ ফাআহবাব্‌তু আন্ উ'রাফা ফা খালাক্‌তুল্ খালকা লী উ'রাফা।"

অর্থ ঃ "আল্লাহ্ পাক বলেন। আমি গুপ্ত ধন ভান্ডার রূপে বিদ্যমান ছিলাম। আমার পরিচিতি হতে বাসনা জাগ্রত হলো। তাই আমি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলাম।" এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ গুপ্ত, সৃষ্টি জগৎও মানুষের নিকট তাঁর পরিচয়ের জন্য বাসনা হলে যাবতীয় যোগ্যতা দিয়েই এই মানুষ বানিয়েছেন।

পূর্বেই লিখিত আছে যে, ক্বলব, রুহ, সের, খফী ও আখফা এই পাঁচটি লতীফায় পাঁচ ধরনের "নূরসমূহ" একত্র হয়ে "মানব সীনায়" নূরসমূহের এক

মহা সাগরে "নূরময়" হয়। সাধকের সীনাও (বক্ষও) এতে প্রশস্ত হয়। আর এত বড় জগৎব্যাপী বক্ষ প্রশস্ত হয় বলেই ঐ বক্ষেই আল্লাহ্ পাকের সিংহাসন হয়। তাই মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

উচ্চারণ ঃ "আলাম্ নাশ্রাহ্ লাকা ছাদ্রাকা" (সূরা ইন্শরাহ্)

মানুষের নিকট আমার সেই বাসনা পরিচয়ের জন্য অর্থাৎ তোমার বক্ষ (সীনা) কে, আমি কি প্রশস্ত করে দেইনি ? রাসূল করিম (সাঃ) ও বলেছেন ঃ

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللّٰهِ*

উচ্চারণ ঃ "ক্বালবুল মু'মিনে আল্লাহ।" ঐ পাঁচ বর্ণের "নূরসমুহ" একত্র হয়ে মানবাত্মাও নূরসমূহের এক "নূরময়" মহা সাগরে পরিণত হয়, তখন মহান আল্লাহ্ কোথাও স্থান নিতে ভালবাসেন না। তাই মু'মিনের অন্ত রাত্মায় আসন গ্রহণে ভালবাসেন। এই জন্যই মুরাকাবা মুশাহাদা করতে হয়।

মুরাকাবা মুশাহাদার মাধ্যমে বক্ষে (সীনায়)ও অন্তরাত্মায় সাধনা গবেষনা করলে অবশ্যই বক্ষ ও অন্তরাত্মায়, দেহসহ বিশ্বব্যাপী "নূরময়" হয়ে নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে আল্লাহতে মিলন হওয়া সহজ হওয় যায়। মুরাকাবা মুশাহাদার অভীষ্ট লক্ষ্যও ইহাই। তবে ঐ সময় বাইরের চোখ বন্ধ ও অন্তর (আত্মার) চোখ খুলে মুরাকাবার সাধনার মূল বিষয় সংশ্লিষ্টতায় মুশাহাদা করতে হয়।

প্রথম মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ*

উচ্চারণ ঃ "নাহ্নু আক্বরাবু ইলাইহি মিন্ হাব্লীল্ ওয়ারিদ্"।

(সূরায়ে কা'ফ, ২য় রুকু)

খেয়াল করবেন যে, মহান আল্লাহ বলতেছেন ঃ "হে আমার বান্দা।" আমি তোমার গর্দানের শাহ্রগের চেয়েও অতি নিকটে আছি। যে ব্যক্তির এই খেয়াল ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহ পাক আমার গর্দানের শাহরগের চেয়েও নিকটে আছেন। সে ব্যাক্তি মা'বুদের খেয়াল ছাড়া এক পলকও থাকতে পারবে না এবং জীবনে একটি গুনাহের কাজও করতে পারবে না। মনে (আত্মায়) এই ভাবনা তৈয়ার করাই মুশাহাদার আসল উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

رَبِّ اَرِنِىْٓ اَنْظُرْ اِلَيْكَ *

উচ্চারণ ঃ "রাব্বী আরিনী আন্‌জুর্ ইলাইকা।" (সূরা আ'রাফ ১৭ রুকু)

হযরত মুসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ "ওহে আমার মা'বুদ! আপনি আমাকে দেখা দিন! আপনাকে আমি প্রাণ ভরে দেখে নেই!" আপনিও যখন মুশাহাদা করবেন তখন হযরত মুসা (আঃ) এর মত এই আয়াত পাঠ করতে করতে, "আত্মায়" পরম করুণাময় আল্লাকে তালাশ করতে থাকবেন। আর আল্লাহ্ পাকের দেখা পাবার জন্য "আত্মায়" ব্যস্ত হয়ে যাবেন। এ আয়াত মর্মে এভাবেই মুশাহাদা করতে হবে। মহান আল্লাহর সহিত দেখা সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই এটা করবেন। এতে অন্যদিকে কোন খেয়াল করা যাবে না।

তৃতীয় মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

لَنْ تَرٰىنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ *

উচ্চারণ ঃ "লান্ তারানী ওয়ালা কিনিন্ জুর ইলাল্ জাবাল"

(সূরা আ'রাফে)

এই আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, হযরত মুসা (অঃ) বলছেন ঃ "ওগো আমার আল্লাহ!" আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে এক নজর দেখে লই!" অন্তরাত্মায় এই খেয়াল করবার সাথে সাথে এ আয়াতের অর্থের খেয়াল এ ভাবেই মনে করতে হবে যে, আল্লাহ পাক জবাবে আপনাকে বলতেছেন ঃ "হে বান্দা" তুমি আমাকে কখনও দেখতে পারবে না তবে যদি তুমি একান্তই আমাকে দেখতে চাও, তবে তুর পাহাড়ের দিকে অর্থাৎ তোমার "সীনার বা বক্ষের (অন্তরাত্মার) দিকে তাকাও (নজর) কর, তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।" আপনার সীনা বা কল্‌বকে (আত্মাকে) তুর পাহাড় মনে করে পরিপূর্ণ ভাবে ধ্যান বা সাধনার সাথে ক্বলবের দিকে তাকিয়ে এই মুশাহাদা করতে হয়। তাতে যা দেখবেন, তা মহান আল্লাহর "নূর" মনে করবেন।

চতুর্থ মুশাহাদা ঃ

উপরোক্ত আয়াতের পরের আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ *

উচ্চারণ ঃ "ফালাম্মা তাজাল্লা রাব্বুহু লিল জাবাল"

আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ) তুর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন যখন আল্লাহ পাক তুর পাহাড়ের উপর আপন নূরের তাজাল্লী ছেড়ে দিলেন, তখন নূরের তাজাল্লীতে পাহাড় টুকরা টকরা হয়ে গেল। এবং হযরত মুছা (আঃ) বেঁহুশ হয়ে জমিনের উপর পড়ে গেলেন। আপনিও যখন হযরত মুছা (আঃ) এর ন্যায় আপনার "সীনারূপ" তুর পাহাড়ের দিকে তাকাতে থাকবেন তখন বিশ্বাস করবেন যে, আল্লাহ পাক আপনার সীনার উপরে নূরের তাজাল্লী ছেড়ে দিয়েছেন এবং এই সময় দিলে দিলে, (আত্মায়-আত্মায়) মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলতে থাকবেন যে, "হে আমার প্রভু! "আল্লাহ"। আপনি দয়া (অনুগ্রহ) করে আমাকে দেখা দেন। এবং এই সময় যা কিছু বুঝতে পারবেন তা আপন উস্তাদ ছাড়া অন্য কারো নিকট প্রকাশ করবেন না।

পঞ্চম মুশাহাদা ঃ

আল্লাহ পাক আরো বলেন ঃ

وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا*

উচ্চারণ ঃ "ওয়া তাবাত্তাল্ ইলাইহি তাবতীলা।" (সূরা মুয্যাম্মেল)

এই আয়াতে অর্থে এরূপ খেয়াল করতে হবে যে, মহান আল্লাহ আমার কাছে থেকে বলছেন, যে, "ওহে বান্দা!" তুমি আমার সাথে মিলনের মত মিলিয়ে যাও, তুমি আমার সহিত মিলনের জন্য বহু দূর দূরান্তের রাস্তা অতিক্রম করে এসেছ, তাই তোমাকে আমি কবুল (গ্রহণ) করে নিলাম। এখন তুমি আমার সাথে মিলনের মত মিলে যাও।

অর্থাৎ তোমার মাটির শরীরটা আছে তা একদিন ঐ মাটির সাথে বিলীন হয়ে যাবে।

অতএব, এখন উহা মটির সাথে বিলীন হয়েছে, এই মনে করে তুমি তোমার "রূহটিকে" (আত্মাটিকে) আমার সাথে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা কর। তুমি যদি পুরাপুরি মিলিয়ে নিতে না পার তবে তোমার আগ্রহ দেখে তোমাকে আমার সাথে মিলিয়ে লইব।

এইভাবে জীবন লীলা শেষ হওয়া পর্যন্ত মহান আল্লাহকে পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতেই থাকতে হবে। তাহলে মহান আল্লাহ আপন অনুগ্রহে একদিন কবুল করে নিবেন।

ষষ্ঠ মুশাহাদা ঃ

পরম করুণাময় আল্লাহ বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *

উচ্চারণ ঃ "আল্লাহু নুরুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদ্।" (সূরা নূর, পঞ্চম রুকু)

অর্থ "মহান আল্লাহ, আকাশ পাতালের নূর।" এই আয়াতটি অর্থসহ বুঝে পাঠ করে খিয়াল করতে হবে যে, আসমান জমিন সমস্তই আল্লাহর নূরের মধ্যে ডুবে আছে। আমিও তাঁর নূরে মধ্যেই চলাফেরা করতেছি। কোন একটি স্থানও আল্লাহ পাকের নূর ছাড়া নেই। আমি তাঁর নূরেই মধ্যেই শয়ন করি, উঠাবসা করি। আমার শরীরে যে বাতাস লাগতেছে তাও মহান আল্লাহর "নূর"। এই ভাবে আয়াতের অর্থের দিকে সবসময় আল্লাহর "নূর ক্বালবের" মধ্যে আটকিয়ে রাখতে চেষ্টা করাই এর মুশাহাদা।

সপ্তম মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ আরো বলেন যে ঃ

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ *

উচ্চারণ ঃ "নূরুন আলা নূরিন।" (সূরা নূর, পঞ্চম রুকু)

অর্থাৎ "নূরের উপর নূর।" এই আয়াতের অর্থে খেয়াল করতে হবে যে, আমার ক্বালব বা সীনা নূরে পরিপূর্ণ। আমার ক্বাললবে নূর সেই নূরের উপর, আবার লতীফা রুহের নূর, তার উপরে লতীফা সেরের নূর তারও উপরে লত্বীফা খফীর নূর এবং আরও উপরে লতীফা আখফার নূর। ঐ নূরসমূহে আমাকে ডেকে নেয়াতে আমি "নূরময়" জগতে ডুবে আছি। তেমনি সীনার উপর নূরসমূহ ও সীনার নিচে লতীফা রূহ্ ও ক্বালবের নূরসমূহের একত্রে বিশ্বব্যাপী নূরে আমি ডুবে আছি। তখন আপনি দেহসহ মহানূরে নিজেকে ফানা বা ধ্বংস করে আল্লাহতে বিলীন হবার চেষ্টায় আল্লাহ পাকের জন্যেই হয়ে যাবেন, তখন মহান আল্লাহও আপনার জন্য হয়ে যাবেন। ইহাই মা'রেফত। এই জন্যই এই মুশাহিদা করতে হয়।

অষ্টম মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ বলেনে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ *

উচ্চারণ ঃ "কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত।"

(সূরা আল ইমরান ১৯ রুকু)

অর্থাৎ "পরম করুণাময় আল্লাহ বলেন যে, প্রত্যেক প্রাণীরই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।" এই অর্থের দিকে খিয়াল করতঃ ভাবতে হবে যে, হযরত আজরাইল (আঃ) মউতের শরবত নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়ত: তখনই আপনার জীবন কবজ করতে পারেন। কিন্তু আমি আমার জান হযরত আজরাইল (আঃ)-কে কবজ করতে দিব না। আমার জান-জীবন মহান আল্লাহর কুদরতের কাছে তুলে দিব। এ আয়াতে এ ভাবনা নিয়েই মুশাহাদা করতে হয়।

নবম মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ *

উচ্চারণ ঃ "খালাক্বাল ইন্‌সানা আ'ল্লামাগুল বায়ান।" (সূরা রাহ্‌মান, প্রথম রুকু)

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক বলেন ঃ আমি মানুষ পয়দা করে তাদেরকে বাকশক্তি বা কথা বলার ক্ষমতা দান করেছি। এই আয়াত পড়ে খেয়াল করবেন যে, আমার শরীরে হাজার হাজার গোস্তের টুকরা আছে। কিন্তু তার কোন অংশে আমি কোনই কথা বলতে পারি না। আল্লাহ পাক আমার জিহ্‌বায় তাঁর অসীম কুদরতে কথা বলার শক্তি দান করেছেন। এ শক্তি আমাকে কেন দান করলেন? দুনিয়ার কথা বলার জন্য, না আল্লাহকে ডাকতে ? তাই তিনি আমাকে "তাঁকে" ডাকার ক্ষমতা দিয়ে আমার হতে তিনি কেন লুকিয়ে থাকবেন? আমি আমার এই জিহ্বা দিয়ে আল্লাহকেই ডাকতে থাকেবো।

দশম মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ আরো বলেছেন ঃ

نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ *

উচ্চারণ ঃ "নূরুহুম্ ইয়াস্‌আ' বাইনা আইদীহিম্ ওয়াবী আইমানিহিম।" (সূরা তাহরীম, দ্বিতীয় রুকু)

আল্লাহ পাক বলতেছেন ঃ "তাদের সামনেও "নূর" এবং ডানেও "নূর", এই অর্থে ইহা খেয়াল করবেন যে, আমি এখন হশরের মাঠে হাঁটছি, এখানে মানুষের মধ্যে কান্নাকাটির রোল পড়েছে। আমি "নূরের" মধ্যে পড়ে আল্লাহ পাকের কুদরত দেখতেছি। আর "নূরের" মধ্যেই মিশে আছি। এই লক্ষেই এই মুশাহাদা করতে হয়।

একাদশ মুশাহাদা ঃ মহান আল্লাহ্ আরো বলছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ *

উচ্চারণ ঃ "ইন্না ফী খাল্‌ক্বীস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরদি।" অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের দলিল আসমান ও জমিন বানানোর মধ্যেই মওজুদ আছে। উহাতে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে যে, উহা মহান আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। অন্য কেহ নহে। এই নিয়ে আপনি খেয়াল করবেন যে, যিনি এই প্রকান্ড আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন। তিনি কত বড় মহান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর কত বড় মহা শক্তি। আর তাঁর এই আকাশ পাতালের মাঝে কোন জায়গা খালি নেই। সমস্তই তাঁর (আল্লাহর) নূরে পরিপূর্ণ। যে দিকেই চোখ ঘুরাবেন সে দিকেই তাঁর "নূর" দেখবেন। এতে কোনই সন্দেহ নেই। তাই বাইরের চোখ বন্ধ করে অন্তরের চোখ খুলে নিয়ে সবগুলো মুরাকাবা ও মুশাহাদায় এইভাবেই সাধনা গবেষনা করতে হয়। তাহলে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই ভাল ফল লাভ করতে পারবেন।

মুহাসাবা

মুহাসাবা অর্থ হিসাব গ্রহণ। অর্থাৎ "অন্তরাত্মায়" সারাদিনের ভাল মন্দ, কাজের হিসাব নেয়া। যেমন ঃ মুখে সারা দিনে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তন্মধ্যে কয়টি কথা সত্য, আর কয়টি কথা মিত্যা বলা হয়েছে এবং আত্মা বা দিলের ভাল মন্দের কল্পনা-জল্পনা সহ চোখে ভাল-মন্দ দেখা ও কর্ণে ভাল-মন্দ শুনায় কি পরিমাণ নেকীর ও কি পরিমাণ বদির কাজ করা হয়েছে এবং কোন্ কোন ইবাদত ছুটে গেছে তার পরিপূর্ণ হিসাব নিরিবিলি সময়ে গ্রহণ করাকে মুহাসাবা বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ *.

উচ্চারন ঃ "ওয়াল্ তানজুর নাফসুম্মা ক্বাদ্দামত লিগাদিন্।"

(সূরা হাশর ঃ ১৮ আয়াত)

অর্থাৎ "প্রত্যেকটি মানুষ পৃথিবীতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে হিসাব করে দেখুক (সারাদিনে ভাল মন্দ কর্ম করে) আগামী অর্থাৎ পরকালের জন্য কি প্রেরণ করে রেখেছে"?

প্রত্যেক দিন নিরিবিলি সময়ে "মনকে" জিজ্ঞাসা করে যদি বুঝা যায় পাপের কর্মই বেশি, তাহলে মনে অনুতাপ প্রকাশ করে পরের দিন পাপ হতে বিরত থাকবেন এবং প্রতিদিন এরূপ অনুতাপকারী আর কখনও পাপ কর্ম করতে পারে না।

মুহাসাবা প্রসঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا *

উচ্চারণ ঃ "হাসিবু ক্বাব্‌লা আন্ তুহাসাবুউ।"

অর্থাৎ "হিসাব লও তোমার নিজের হিসাব পরকালে আল্লাহ্ কর্তৃক হিসাব নেওয়ার পূর্বে।" তাই হযরত উমর (সাঃ) সারাদিন কর্তব্য পালন করে ঘরে এসে অবসর সময়ে পায়ে বেত্রাঘাত করে বলতেন "এই "পা" আজ সারাদিন তুমি কয়টি ভাল কাজ করেছ, আর কয়টি মন্দ কাজ করেছ তার হিসাব দাও।" এই ভাবে প্রত্যেক অঙ্গের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব অবসর সময়ে নিতে হয়। আর ইহাকেই মুহাসাবা বলা হয়।

শোগল

দেল দেলে বা আত্মায় সর্বদাই মহান আল্লাহকে খেয়াল্ ভাবনা করা। অর্থাৎ চলতে ফিরতে, উঠা বসা, কাজে-কর্মে, অবসর শয়নে, সর্বদাই অন্তরে (আত্মায়) আল্লাহ মহানকে খেয়াল ভাবনা করার নামই শোগল।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ *

উচ্চারণ ঃ "ইন্নাহু আলিমুম্ বিযাতিছ্ ছুদুর্।"

অর্থাৎ "মহান আল্লাহ তো অন্তরের অন্তস্থলেরও খবর রাখেন"। তাই সর্বদাই লক্ষ্য করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা গুপ্ত-প্রকাশ্য, জাহের-বাতেন এবং সারা জগতের সমস্ত অবস্থার খবর রাখেন। অর্থাৎ সর্বক্ষণ মনে এই হিসাব রাখা ও খেয়াল করাই শোকর আলহামদু লিল্লাহ্!

দোয়া করবার নিয়মসমূহ

* কোন উদ্দেশ্য উল্লেখ না করে বরং এই বল্‌তে হয় যে, হে আল্লাহ আমার মনের নেক মকছুদ পূরণ করে দিন।

* দোয়াতে দুনিয়া ও পরকালের জীবনের কল্যাণ চাওয়া।

* দোয়াতে শর্তযুক্ত না করা অর্থাৎ কয়েকদিনের মধ্যেই আমার দোয়াটা কবুল করুন, এমন না বলা এবং দোয়াতে তাড়তাড়ি না করা।

* পূর্বে কিছু নেক কাজ করে নবী রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, ওলী আওলীয়াদের উপলক্ষ্য করে দোয়া করা।

* মনকে মহান আল্লাহর প্রতি রূজু করে খুব বিনয়ের সহিত দোয়া করা।

* অতীত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, আর পাপ না করার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

* ইহ-পরকালের কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহর কাছে যা চাইবেন তার আগে ও পরে কয়েকবার যে কোন দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়।

* দোয়ার সময় দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠায়ে হাতের তালু আকাশের দিকে রাখতে হয়।

* কারো অনিষ্ট হয়, এমন না চেয়ে বরং হোদায়েতের কামনা করে দোয়া করতে হয়।

* মৃত ও জীবিত সকল মুরুব্বীয়ান ও মুসলমান নর নারীদের জন্য দোয়া করা।

* দোয়াতে ক্রন্দনের চেষ্ট করা অথবা ক্রন্দনের মত চেহারা মলিনময় করা।

* দোয়াতে বেহেশতের আশা ও দোজখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহান আল্লাহর নিকট আকুতি জানানো।

* দোয়ার পূর্বে দান করা সম্ভব না হলে অন্তত: কয়েক বার আল্লাহর নামে যিকির করা।

* সাধ্যানুযায়ী অজুর সহিত দোয়া করা।

* কোন মন্দ বা পাপের কর্মে সফলতার জন্য দোয়া না করা।

* বিশেষ দরকারী বিষয় হলে শব্দগুলো তিনবার উচ্চারণ করা এবং আমীন আমীন বলা।

* পিতা মাতা সহ, উস্তাদ, মুরুব্বী, ভাইবোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, আত্মীয় স্বজন, দেশি বিদেশি মুসলমান নর নারীদের কল্যাণের জন্য দোয়া করতে হয়।

যাদের ইবাদত ও দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়

যাদের ইবাদত ও দোয়া গ্রহণযোগ্য হয় না তাদের সংখ্যা অনেক। তবে তার অল্প সংখ্যক নিম্নে লিখিত হলো।

১. হারাম উপায়ে উপার্জিত খাদ্য খেয়ে যার রক্ত মাংস ও হাড্ডির দ্বারা দেহ শরীর গঠিত হয়েছে, তার কোন ইবাদত ও দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

২. তেমনি নিন্দা বা বদনামকারীর ইবাদত ও দোয়া।
৩. ধন সম্পত্তি কামাই করার জন্য এবং মানুষের কাছে প্রশংসা পাবার জন্য ইবাদত ও দোয়া করলে।
৪. কোন অহংকারীর ইবাদত ও দোয়া।
৫. নাম জাহেরী ও লোক দেখানো ইবাদত ও দোয়া।
৬. আত্মাভিমান ও বড়াইকারীদের ইবাদত ও দোয়া।
৭. ঈর্ষাকাতর, পরশ্রীকাতর, কলহপ্রিয় ও কর্কশভাষীদের ইবাদত ও দোয়া।
৮. নির্মম, নির্দয় ও পরমূখী বান্দার ইবাদত ও দোয়া।
৯. অমনোযোগ, অবহেলা ও খামখিয়ালীর সহিত ইবাদত ও দোঁয়া।
১০. পিতা মাতা, উস্তাদের সহিত বেয়াদবী ও অবাধ্যকারীর ইবাদত ও দোয়া।
১১. পূর্ব পাপের জন্য অনুতপ্ত না হয়ে ইবাদত ও দোয়া।
১২. অন্যায়ভাবে কারো উপর অত্যাচার করলে তার ইবাদত ও দোয়া।
১৩. সব সময় পাপের মধ্যে লিপ্ত থাকলে তার ইবাদত ও দোয়া।
১৪. আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে চায় এমন লোকের ইবাদত ও দোয়া।
১৫. আল্লাহ ও রাসুল (সাঃ)-এর কোন আদেশের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ, মনোভাব পোষণকরারীর ইবাদত ও দোয়া।
১৬. দুঃখে পড়ে মহান আল্লাহকে গলি দোয়া।
১৭. সুখের সময় আল্লাহ্ পাকের ইহসান যে ভুলে যায় তার ইবাদত ও দোয়া আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

যাঁদের ইবাদত ও দোয়া কবুল হয়

কাদের ইবাদত ও দোয়া কবুল হয় তা মহান আল্লাহ্ পাকই ভাল জানেন। তবে হাদিস মর্মে যতটুকু জানা যায়, তাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের ইবাদত দোয়াই বেশির ভাগ কবুলের যোগ্য হয়।

১. নেককার, পরহেজগার, যিকিরকারীদের দোয়া ও ইবাদত, যাঁরা ইবাদতে আল্লাহর নূরে "নূরময়" হয়ে ডুবে থেকে নিজকে ফানার দৃষ্টিতে দেখে।
২. যে ইবাদত, যিকিরকারী নিজের জিহ্বাকে সব সময় মহান আল্লাহর যিকির ও ইবাদত দ্বারা তরতাজা রাখে।

৩. আত্মা বা অন্তরকে দুনিয়ার মহব্বত হতে খালি করে যে সবসময় আল্লাহ পাকের মহব্বতের দিকে নিজের অন্তরকে রুজু করে রাখে।

৪. অত্যাচারিতদের দোয়া ইবাদত, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অত্যাচারির উপর প্রতিশোধ না নেয়।

৫. অসুস্থ ব্যক্তির ইবাদত ও দোয়া, যতক্ষণ সে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থাকে।

৬. হাজীদের ইবাদত ও দোয়া, যখন তাঁর হজ্জকার্য শেষ করে বাড়ী আসার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে ইবাদত ও দোয়া করেন।

৭. ইসলমী যোদ্ধাদের ইবাদত ও দোয়া, যখন তাঁরা লড়ায়ের ময়দানে লিপ্ত থাকেন।

৮. মুসাফিরদের ইবাদত ও দোয়া, যখন তাঁরা সফর অবস্থায় থাকেন।

৯. অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করে দেন, তাঁর ইবাদত ও দোয়া।

১০. সন্তানদের জন্য পিতা মাতার দোয়া, শাগরেদদের জন্য পীর উস্তাদের ও মুরুব্বীগণের দোয়া।

১১. রোজাদার মানুষের দোয়া ও ইবাদত, তিনি যখন ইফতার সামনে নিয়ে বসেন।

১২. ন্যায় বিচারকের ইবাদত ও দোয়া, যখন তিনি ইনছাফভিত্তিক বিচার কার্যে লিপ্ত থাকেন।

দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময়সমূহ

দোয়া কবুলের উপযুক্ত সময় মহান আল্লাহই ভাল জানেন, সে জন্য সব সময়ই আল্লাহ পাকের রহমত ও বরকত পাবার আশায় দোয়া করা উচিৎ। এছাড়াও কতগুলো বিশেষ বিশেষ সময় আছে, যে-সে সময়ের দোয়া বিফল হয় না। সে সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাকের বিশেষ রহমত ও বরকত রেখে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর দরবারে দোয়া চাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কিছু কিছু বিশেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা দ্বারা মানবগণ অল্প পরিশ্রমেই অনেক লাভবান হতে পারেন এবং ইহ-পরকালে অনন্ত সুখ শান্তি অর্জন করতে পারেন। তজ্জন্য মহানবী (সাঃ)-এর নিকট মহান আল্লাহ কতগুলো

সময় যে নির্ধারণ করেছেন তা নিম্নে বর্ণিত হলো। মহানবী (সাঃ) এর ঐ বাণীগুলো মুসলীম শরীফ, তিরমিজী ও আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত রয়েছে।

১. প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর।
২. সিজদায় থাকা অবস্থায়।
৩. পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের পর।
৪. প্রত্যেক শেষ রাতে, বিশেষকরে শুক্রবার রাতে।
৫. শুক্রবার দিন আছরের নামাযের পর হতে সুর্য ডুবা পর্যন্ত সময়।
৬. বরাত ও ক্বদরের রাত্রির সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়।
৭. জমুআর খুতবার সময় ও দু'খুতবার মধ্যবর্তী সময়।
৮. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।
৯. রমজান মাসে, বিশেষভাবে ছেহরী ও ইফতারের সময়।
১০. আযানের সময়।
১১. পবিত্র হজ্জের রাতে ও হজ্জের সময়।
১২. তাওয়াফ করার সময়, সায়ী' করার সময়, মিনা, মুজদালিফা এবং আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে।

যুহদ এর পরিচয়

যুহদ অর্থ উদাসীন। ইসলামে যুহদ অর্থ সংসার বিরাগ, দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য ও উদাসীন হওয়াকে যুহদ বলে। ইহার দু'টি অবস্থা ঃ

* দোজখের আযাব থেকে মুক্তি এবং বেহেশত লাভের জন্য দুনিয়া ত্যাগি হওয়া, এ যুহদ তুচ্ছ শ্রেনীর।

* একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ও পরকালের চিন্তা ভাবনাও বাদ দেওয়া। ইহাই উন্নতমানের যুহদ। প্রথম অবস্থাটা যোহদের ছুরত, আর দ্বিতীয়টি হলো ঃ যুহদের হাক্কীকত।

দুনিয়া অভিশপ্ত

যা বান্দাকে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে দূরে রাখে, উহাই "দুনিয়া"। মহান আল্লাহ বলেন "হে ঈমান্দরগণ, তোমার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন তোমাদেরকে গাফেল না করে। যারা গফেল হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।"

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ "নিশ্চয়ই দুনিয়া খেলাধূলা, চক্ষুর তৃপ্তি, পরস্পর গৌরব অহংকার, মাল-দৌলতের বাহদুরী ছাড়া আর কিছুই নহে।

উহাতে মানুষকে পাপে লিপ্ত করতঃ আল্লাহকে মন থেকে ভুলিয়ে দেয়। সে জন্যেই দুনিয়ার মায়া মোহ ত্যাগ করত। আল্লাহমূখী হওয়াই যুহদ। তবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ উপার্জন করা ইবাদত বা বন্দেগী।

একবার হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কারো নিকট হতে ধার নিলে আল্লাহপাক বলেন, আমিই তো তোমার বন্ধু। আমার নিকট চাইলে না কেন ? তিনি বললেন, আপনি তো দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। কাজেই আপনার নিকট চাইতে আমার ভয় হয়েছিল। তখন মহান আল্লাহ বলেন যে, জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনী বস্তু তো দুনিয়াদারী নয়।

রাসূলে করিম (সাঃ) একদা পথ চলাকালিন একটি মৃত ছাগল দেখে ছাহাবাদের বললেন ঃ ছাগলের মালিক মৃত ছাগলটিকে যেভাবে ঘৃণায় ফেলে দিয়েছে, মহান আল্লাহ তদ্রুপ দুনিয়াকে ঘৃণা করেন। আল্লাহর নিকট দুনিয়াটা এতটুকু ঘৃণার কারণেই দুনিয়াতে কাফিরদের জন্য সুখের জায়গা করে দিয়েছেন। তা না হলে কাফেরদেরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।

প্রিয়নবী (সাঃ) একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কে বলেন, দেখ এই যে, মৃত মানুষের মাথার খুলী, পায়খানা, হাড্ডী ও ছিন্ন কাপড়। এই খুলী দুনিয়ার শান্তির জন্য মানুষ হিসেবে কত রকম আশা নিয়েছিল, আজ সে মৃত, পায়খানা কত সুন্দর ফল খাদ্য হিসেবে ছিল, আজ পায়খানা। হাড্ডী কত আশা নিয়ে দুনিয়ার মায়া করেছিল, আজ হাড্ডী। ছিন্ন কাপড় কত যে মূল্যবান কাপড় হিসেবে ছিল, সবই আজ ছেঁড়া বস্ত্র, ইহা আজ সবই মূল্যহীন। ফলে আল্লাহর নিকট এ দুনিয়া এই জন্যই মূল্যহীন গৃণিত স্থান। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এ কারণেই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করত ঃ আল্লাহর প্রতি ভয়-ভক্তিই উন্নতমানের যুহদ। আর যারা যুহদের গুণে গুনান্বিত তারা যাহিদ।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর নিকট উপস্থিত ছিলেন, তিনি শরবত চাইলেন। পানি মধু এনে তাঁর নিকটে রাখলে তিনি কাঁদলেন অন্যরাও কাঁদলেন। অতঃপর তাঁকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন ঃ আমি দয়াল নবী (সাঃ)-এর খিদমতে একবার হাযির ছিলাম। তিনি যেন কাউকে তাড়াচ্ছেন ; আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কাকে তাড়াচ্ছেন ? হুজুর (সাঃ) উত্তরে বললেন "দুনিয়াকে"। হে দুনিয়া তুমি দূর হও, সে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে, বলল আপনি আমা হতে বেঁচে গেলেন, কিন্তু আপনার পরে মানুষ আমার দিক হতে মুখ ফিরাবে না। তাই আমি পরবর্তি মানুষদের চিন্তায় কাঁদছি।

হযরত ঈসা (আঃ) এর সম্মুখে একবার দুনিয়া এক বৃদ্ধা রমনীর আকৃতিতে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধার গাঁয়ে সর্ব প্রকার অলংকার গহনা শোভা পচ্ছিল। তিনি দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি এ পর্যন্ত কতজন স্বামী গ্রহণ করছিলে? দুনিয়া বলল, তা আমার সঠিক জানা নেই। আবার প্রশ্ন করলেনঃ তারাই তোমাকে ত্যাগ করল, না তুমিই তাদেরকে ত্যাগ করলে? বৃদ্ধা রমনী দুনিয়া বলল, আমিই তাদেরকে হত্যা করেছি।

হাশরের মাঠে ফেরেস্তাগণ শিকলে বেঁধে বিশাল আকৃতি কুৎসিৎ এই দুনিয়াকে হাজির করবেন। যার হুংকারে হাশরবাসী আতংকিত হবেন। এবং হাশরবাসী বলবেন, "হে আল্লাহ! এ ভয়ংকর বৃদ্ধা কে ? আল্লাহ পাক বলবেন, ইহাই "দুনিয়া"। যার প্রেমে পড়ে আমাকে ভুলেছিলে।

অতঃপর দুনিয়াকে দোজখে নিক্ষেপের জন্য ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ করবেন। দুনিয়া তখন বলবে "হে আল্লাহ! আমি একা দোজখে যাব না। তথায় আমার প্রমিক যারা ছিল তাদেরকেও দোজখে নিয়ে যাব।

মহান আল্লাহ তখন বলবেন ঃ তেমার প্রেমিকদের বেছে বাহির করে দোজখে নিয়ে যাও। দুনিয়া নির্দেশ পেয়ে এক হেচকা টান মারবে, ফলে হাশরের মাঠ প্রায় খালি হয়ে যাবে।

যুহুদের সুরত : খোদাপ্রাপ্তির পথে দুনিয়ার আকর্ষণ হতে মুক্ত হওয়া। এতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। লতীফাগুলোও আল্লাহ পাকের পথে আলোকিত হয়। এই সময় তাঁকে কিছু ক্ষমতাও দেখানো হয়। যেমন ঃ

* সমুদয় সৃষ্টি জগৎ দেখবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।
* বাক্যসিদ্ধি দান করা হয়।
* কারামত দেখানোর ক্ষমতা দেয়া হয়।
* সমাজে জনপ্রিয়তাও দান করা হয়।

গরীবদের ফজিলত

গরীবদের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি দয়াল নবী (সাঃ) এর নিকট এসে বললঃ ওহে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি গরীবদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট এসেছি ঃ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ঃ উত্তরে বললেন "তোমাকে স্বাগতম, মোবারকবাদ"। প্রতিনিধি বললেন ঃ "ওহে আল্লাহ রাসুল (সাঃ)! ধনীরা তো পরকালের সমস্ত নেকী কুড়িয়ে নিতেছেন, কারণ

তারা গরীবদের দান করে, যাকাত দেয়, হজ্জ করে নেকী অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছেন। আমরা তো–তা পারি না।" রাসূলে করিম (সাঃ) বললেন "তুমি যাদের নিকট থেকে এসেছ আমি তাদেরকে বড়ই ভালবাসি। তুমি ফিরে গিয়ে তাদেরকে এই তিনটি বিষয়ে সুসংবাদ দিবে যে, যা ধনীদের ভাগ্যে কখনই জুটবে না। যথা ঃ

বেহেশেতে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে কতগুলো উজ্জল আলোকময় প্রকোষ্ট রয়েছে যা সাধারণ বেহেশতীগণ নিম্নদেশ হতে ঐ প্রকোষ্টগুলো এত উচ্চে দেখবে যেমন ঃ পৃথিবীর লোকজন আসমানের "নক্ষত্র তারকারাজী" দেখে থাকে। ঐ মনোহর প্রকোষ্টগুলো গরীব পয়গম্বর, গরীব মুসলমান ও গরীব শহীদগণই প্রাপ্ত হবেন। আর কেউ না।

দরিদ্র গরীব মুসলমানগণ, ধনী লোকদের চেয়ে পাঁচ শত বছর পূর্বে বেহেশতে যাবেন। (যা ধনীদের ভাগ্যে হবে না)

গরীব লোক যদি শুধু একবার পড়ে ঃ "সোবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহ।" আর ধনীলোক উক্ত তসবীহ দশবার পড়ে নিয়ে তৎসঙ্গে আরো দশহাজার দেরহাম দান করে দিলেও গরীরের সমান মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। প্রতিনিধি ফিরে এসে গরীবদের ঐ সুসংবাদ দিলে সবাই সন্তুষ্ট ও খুশী হলেন। (মুসলিম ও বুখারী শরীফ)

পাহাড়ে গর্ত বাসীদের ঘটনা

বিপদ-মছিবত হলে কি করবেন?

উত্তর : আপনি পূর্বকৃত যে কোন পূণ্য বা নেকী অর্জন করে থাকলে- বিপদের সময় উদ্ধারের কোন উপায় না পেলে মুক্তি পাবার জন্য ঐ নেকীর কর্ম অছিলা করে মহান আল্লাহ্র নিকট মুনাজাত করলে অবশ্যই বিপদ-মছিবত হতে উদ্ধার বা মুক্তি পাবেন। ইন্শা আল্লাহ!

এ সম্পর্কে একটি হাদিস ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : (ইস্রাইল বংশের) "তিনজন লোক (বিশাল এক ময়দান দিয়ে) কোথাও যেতেছিলেন। ঐ সময় প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল। তারা নিরুপায় হয়ে পাহাড়ে একটি গর্ত ছিল, উহাতে তারা ঢুকে পড়লেন।

অতঃপর পাহাড়টির উপর হতে একটি বিশাল পাথর নেমে এসে গর্তের মুখ সম্পূর্ণই ঢেকে পড়ল। সকলেই দিশেহারা হয়ে তখন একে অপরজনকে

বললেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ অর্জিত নেকীর দিকে তাকান, যা মহান আল্লাহ্‌র মহব্বতেই করেছিলেন এবং "ঐ নেকীকে" অছিলা করে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন, যেন, গর্তের মূর্খের পাথর আমাদের মুক্তির জন্য সরে যায়।

* "এ বিষয়ে প্রথম একজন বললেন যে, আমার পিতা-মাতা, বার্ধক্যের কারণে খুব দুর্বল হয়েছিলেন। উপরন্তু আমার স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেও ছিল, তাহাদের লালন-পালনের জন্য আমি মাঠে ভেড়া-ছাগল, চরাতাম। সন্ধ্যা কালিন উহা নিয়ে বাড়ীতে এসে দুধ দোহন করে প্রথম পিতা-মাতাকেই পানাহার করাতাম। পরে ছেলেদের সহ আমরা পানাহার করতাম। ইহাই ছিল প্রতিদিনের নিয়ম।

হঠাৎ একদিন উক্ত মাঠে চারণ ভূমিতে ঘাস না থাকায় বহুদূরের এক মাঠে ভেড়া-ছাগলগুলো নিয়ে চরাতে যাওয়ায়-বাড়ীতে আসতে অনেক রাত হয়ে যায়। পিতা-মাতা তখন ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

অতঃপর, নিয়ম মত দুধ দোহন করে পিতা-মাতাকে খাওয়ানোর জন্য ঘুমন্ত পিতা-মাতার শিয়রে দুধ হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমতাবস্থায় আমার নিকট খারাপ লাগলো যে, ঘুম ভাঙ্গালে তাদের কষ্ট হবে– আরো খারাপ মনে হলো যে, পিতা-মাতার আগে ছেলেদের সহ আমাদেরও পানাহার করা ঠিক হবে না। বাচ্চাগুলো ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে এসে কাঁন্নাকাটি করছিল। দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে এমনিভাবে শেষ রাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও ছেলেরা সহ আমরা কেহই পানাহার করিনি। রাত্রি শেষে পিতা-মাতা ঘুম থেকে জেগে উঠ্‌লে তাদেরকে আগে দুধ পান করাই পরে ছেলেরা সহ আমরা পান করি। ওহে মহান আল্লাহ্‌! ইহাতো একমাত্র আপনাকেই রাজি-খুশি করার জন্যই করেছি। নেকীর এই ঘটনাকে স্মরণ করে, তিনি ঐ গর্তেই প্রার্থনা করলেন, ওহে, মহান আল্লাহ্‌! ঐ নেকিটির অছিলায়– এই বিপদ মুক্তির জন্য গর্তের মুখের এক অংশ পাথর সরিয়ে দিন যেন, আমরা আকাশ দেখতে পাই। এই প্রার্থনায় মহান আল্লাহ্‌! তাদের বিপদ মুক্তির জন্য গর্তের মুখের এক অংশ হতে পাথর সরিয়ে দিলেন। তাতে তাঁরা আকাশ দেখ্‌তে পেলেন।" সোব্‌হানাল্লাহ!

দ্বিতীয়জন বললেন : "আমার অতি মহব্বতের এক চাচাতো বোন ছিল। তাকে অন্যায়ভাবে ভালবাসতাম, যেমন– অন্যেরাও ভালবাসা করে থাকে। অর্থাৎ-ঐ বোনটির প্রতি অসামাজিকভাবে আশেক ছিলাম, যা হারাম

ছিল। বোন্‌টি আমাকে বললো যে, যে পর্যন্ত আমাকে একশত দেরহাম না দিবেন, আমি তাতে রাজি হবো না। তখন আমি চেষ্টা তদ্‌বীর করে একশত দেরহাম এনে তার হাতে দিয়ে জেনা কর্মে লিপ্ত হতে চাইলাম। ঐ সময় বোন্‌টি বললো : খবরদার– "আপনি আল্লাহ্‌কে ভয় করেন। বিবাহ্ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করবেন না"। তার এ কথায় সত্যি আমি মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে সরে পড়লাম এবং এ কাজ থেকে বিরত থাকলাম।

এই ঘটনার কথা মনে করে গর্তটির ভিতর মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে বললাম, ওহে আল্লাহ্ পাক! "আমিতো আপনার ভয়েই" আপনাকে খুশি করবার, জন্যেই ঐরূপ অন্যায় কর্ম হতে দূরে সরে পড়েছিলাম।

অতএব এই বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য, আপনি অনুগ্রহ করে গর্তের মুখের আর একটি অংশ হতে পাথর সরায়ে দিন। তার এই প্রার্থনায়– মহান আল্লাহ্! গর্তটির মুখের আরো একটি অংশ খুলে দিয়ে পাথর সরিয়ে দিলেন।' সোব্‌হানাল্লাহ!

* তৃতীয় জন বললেন : "ওহে মহান আল্লাহ্! আমি অনুমান দুই কেজি চাউল মজুরী ধার্য্য করে একজন শ্রমিককে কাজের জন্য ঠিক করলাম। কাজ শেষে তার পাওনা দাবী করলে– উক্ত চাউল দ্বারা তার পাওনা পরিশোধ করবার জন্য তার সামনে রেখে দিলাম। তাতে সে উক্ত চাউল না নিয়ে কোথায় যে চলে গেল খোঁজ নেই। তখন আমি তার পাওনা শোধে নিরুপায় হয়ে উক্ত চাউলের মূল্য পরিমাণ অর্থে আর জন্যেই ক্ষেতের বীজ ক্রয় করে ক্ষেতে বুনে দিলাম। তাতে ক্ষেতে ফসল হয়ে অনেক রকত হলো। উহা দ্বারা তার জন্যেই "গাভী বলদ ও উহা চরানোর জন্য ঐ অর্থেই একটি রাখাল ঠিক করে" মাঠে চরানোর জন্য পাঠিয়েছিলাম।

এমতাবস্থায়– সে একদিন আমার নিকট এসে দাবী করলো– এবং বললো যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, আমার পাওনা দিয়ে দিন। আমার পাওনা নষ্ট করবেন না।' আমি তাকে, তখন বললাম– যাও, ঐ যে গাভী-বলদ ও রাখাল দেখ্‌তেছো, উহা সবই তোমার। তুমি ঐ সব নিয়ে নাও। শ্রমিক বললো যে, আল্লাহ্‌তো মহান জব্বার! "তাঁকে ভয় করেন" আমার পাওনাটা দিয়ে দিন : ঠাট্টা করবেন না। তখন আমি পাওনাদার শ্রমিককে বললামঃ তোমার পাওনা চাউল বিক্রি করে ক্ষেতের বীজ ক্রয় করে ক্ষেতে বুনে দিয়ে, যে ফসল উৎপন্ন হয়েছে তদ্বারা ঐ গাভী-বলদ ক্রয় করলাম এবং রাখালও ঠিক করেছি– উহা সব তোমার! তোমার পাওনা তুমি নিয়ে নাও। তোমাকে ঠাট্টা করছি না। অতঃপর, মজদূর (শ্রমিক) তার শ্রমের মূল্য পরিশোধে উক্ত গাভী-বলদ ও রাখাল সহ সবই অতি খুশি মনে গ্রহণ করে নিল।

অতঃপর, এই তৃতীয় গর্তবাসী বললেন : "ওহে আল্লাহ্ পাক! উহাতো আমি একমাত্র আপনাকেই রাজি-খুশি করবার জন্যই করেছি। ঐ নেকীটির "অছিলায়" এই বিপদ মুহূর্তে অণুগ্রহ করে গর্তের মুখের অবশিষ্টাংশের পাথরটি সরিয়ে দিয়ে গর্তের মুখ সম্পূর্ণই খুলে দিন।" এতে মহান আল্লাহ্! তাঁরও প্রার্থনা কবুল করে গর্তের মুখের বাকী অংশও খুলে দিয়ে পাথরটি সম্পূর্ণই দূরে সরিয়ে দিলেন। সোব্হানাল্লাহ্! অতঃপর সবাই ঐ গর্তের বিপদ হতে বের হয়ে, মুক্তি পেলেন। (মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড : পৃষ্ঠা, ৩৫৩। এ ঘটনাটি বুখারী শরীফেও উল্লেখিত আছে)।

হাদিসটিতে শিক্ষা ও উপদেশ

* কেহ, যে কোন বিপদ-মছিবতে আক্রান্ত হলে, যদি কোন উপায়ন্তর না থাকে– তা-হলে ঐরূপ খাঁটি নেকীর কর্মকে "অছিলা করে" পরম করুণাময় আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করলে, অবশ্যই মহান আল্লাহ্ তা কবুল করেন।

* পিতামাতার অধিকার, নিজের ও স্ত্রীসহ্ ছেলেমেয়ের অধিকার থেকে অগ্রগামী মনে করে আদায় করতে হবে। প্রধান্য দিতে হবে। এটা মহৎ নেকীর কাজ।

* মহান আল্লাহকে ভয় করে যে কোন পাপ কাজ হতে সরে এলে- এতে আল্লাহ্ পাক্, অত্যান্ত খুশি হোন।

* তেমনি পাওনা দারদের পাওনা, তাড়াতাড়ি পরিশোধ করলে মহান আল্লাহ মহা-খুশি হোন।

বিপদ-মুছিবত হতে মুক্তি পাবার একটি হাদিস

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত : আল্লাহ্ পাকের রাসূল হযরতে সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজ্তোবা (সা.), যে কোন বিপদ-মছিবতের সময় এই দোয়া পড়তেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ . لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ .

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ আজিমুল, হালিমু-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল্ আর্দি রাব্বুল আর্শিল্ কারীম।" মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-৩৫১

রুগ্ন ব্যক্তির পরীক্ষা ও শিক্ষা

হাদিস : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত : হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :বনি ইস্রাঈলের তিনজন রোগ্ন মানুষ- একজন ধবল রোগী, একজন টাক্ওয়ালা আরেক জন অন্ধ মানুষ ছিলেন।

তাদেরকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ছিল। তাই মহান আল্লাহ্! মানুষের আকৃতিতে একজন ফিরিস্তাকে প্রথম ধবল রোগীর নিকট পাঠালেন, ঐ ফিরিশতা ধবল রোগীকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার নিকট সবচেয়ে কোন জিনিস পছন্দনীয়। তিনি বললেন : আমার শরীরের উত্তম রং ও চাম্ড়া যেন ভাল হয়ে রোগ দূর হয়।

কারণ– এর জন্য জনগণ আমাকে ঘৃণা করে। এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বললেন : ফিরিস্তা তাঁর শরীর হাত দ্বারা মুছে দিলেন। তাতে তাঁর শরীরের রং-চাম্ড়া ভাল হয়ে জনগণের নিকট ঘৃণা দূর হলো। তারপর ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করলেন : কোন সম্পদ আপনার নিকট বেশি পছন্দ। তিনি বললেন : উট অথবা গাভী। এতে ইসহাক বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন যে, হাদসটিতে এক বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিল। তাই ধবল অথবা টাক্ওয়ালা দু'জনের একজন হয়ত: উট, অন্যজনে গাভী চেয়েছিলেন। অতএব-ফিরিশতা- ধবল রোগীকেই দশ মাসের একটি গাভীন উট দিয়ে বললেন : এটা গ্রহণ করুন– মহান আল্লাহ্! এতে আপনাকে অনেক বরকত দিবেন।

রাসূল কারিম (সা.) আবার বললেন : অতঃপর ফিরিশতা টাক্ওয়ালার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন– আপনার নিকট কোন জিনিষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ! তিনি বললেন : আমার এই রোগ দূর হয়ে যেন ভাল চুল গজায় এবং জনগণের নিকট ঘৃণাও দূর হয়। সেজন্য ফিরিশতা, তার মাথায় হাত মুছে দেওয়ায় রোগ ভাল হলো। ভালো চুল গজালো। এবং ফিরিশতা তাকেও জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট কোন সম্পদ সবচেয়ে বেশি ভাল মনে হয়– তিনি বললেন– একটি গাভীন গাভী। অতঃপর ফিরিশতা তাকেও একটি গাভীন গাই দিয়ে বললেন : এতে আপনার বহুত বর্কত হবে। এর পর হুজুর (সা.) বললেন : অত:পর ফিরিশতা অন্ধের নিকট গিয়েও জিজ্ঞাসা করলেন– ওহে, আপনার নিকট কোন জিনিষ সবচেয়ে বেশি পছন্দ? অন্ধ বললেন : লোকজনকে যেন দেখতে পাই, তাই মহান আল্লাহ্‌র নিকট চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি শক্তি চাই।

হুজুর (সা.) বললেন : ফিরিশতা তার চোখে হাত মুছে দেওয়ায়, আল্লাহ্ পাক তাকে দৃষ্টি শক্তি দিলেন। লোকজনকে তিনি দেখতে পেলেন।

তৎপর ফিরিশতা তাকে বললেন : এরপর আপনার কাছে সবচেয়ে কোন সম্পদ বেশি পছন্দ। উত্তরে বললেন যে, একটি গাভীন ছাগল। ফিরিশতা তাকেও একটি গাভীন ছাগল দিলেন। আর বললেন- যে, এতে আপনারও অনেক বরকত হবে।

অত:পর সময়মত ঐ উঠ, গাভী ও ছাগল বাচ্চা দিল। ক্রমান্বয়ে ঐগুলোর বাচ্চা হতে হতে, ধবল রোগীর বহু উঠ, টাক্ওয়ালার বহুত গরু ও অন্ধের বহুত ছাগলের বন-মাঠ ভরে গেল।

এতদ প্রসঙ্গে রাসূল কারিম (সা.), বললেন যে, বহুদিন পর ঐ ফিরিশতা আগের মতই মানুষের ছুরতে এসে প্রথম ধবল রোগীকে পরীক্ষার জন্য বললেন : আমি একজন অভাবী, সফরে বের হয়ে এসে আমার সব সম্বল ফুরিয়ে খালি হাত হয়েছি। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতিত গন্তব্যস্থানে পৌছা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ পাকের নামেই আপনার নিকট কিছু সাহায্য চাচ্ছি। যিনি আপনার ধবল রোগ সেরে শরীরের রং ও চামড়া ভাল করে বহুত উট দান করেছেন। উহা হতে আমাকে একটি উট দান করুন যেন- এই সফর-ভ্রমণে, অভাব কাটিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।

ধবল রোগী বল্লেন : আমি বহু ঋণদার, সংসার পরিচালনায় এমন কোন সম্পদ আমার কাছে নেই, যা আপনাকে দিতে পারবো। অত:পর ফিরিশতা বললেন : আমি আপনাকে অবশ্যই চিন্তে পেরেছি। ইতিপূর্বে আপনি ধবল রোগী ও চরম অভাবী ছিলেন। লোকে আপনাকে ধবল রোগের কারণে কতনা ঘৃণা করত। মহান আল্লাহ! আপনার রোগ আরোগ্য করে উট দ্বারা বহুত সম্পদ দানে অণুগ্রহ করছেন। তদুত্তরে ধবল রোগী বললেন : আমিতো ঐ সম্পদ বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি তারা কয়েক যুগ পর্যন্ত ধনী ও বড়লোক ছিলেন। ফিরিশতা বললেন : আপনার কথা যদি মিথ্যা হয়- তাহলে মহান আল্লাহ্! আপনাকে পূর্ব রূপে ফিরিয়ে দিয়ে ভীষণ অভাবী করে দিবেন।

অতঃপর ফিরিশতা, পূর্ব বেশে (ছুরতে) টাকওয়ালার নিকট সাহায্যের জন্য এসে বললেন : যেমন- ধবল রোগীকে বলেছিলেন। ধবল রোগী ফিরিশতাকে সাহায্য না করে যেভাবে মিথ্যা বলে ফিরিয়ে দিয়েছিল; টাক্ওয়ালাও সেভাবেই মিথ্যা বলে সাহায্য না করেই ফিরিশতাকে ফিরিয়ে দিলো। তখন ফিরিশতা টাক্ওয়ালাকেও বললেন : আপনার এই কথা যদি মিথ্যা হয়- তবে মহান আল্লাহ্ আপনাকেও পূর্ব রোগে ফিরে দিয়ে অভাবী করে দিবেন।

অতঃপর রাসূল করিম (সা.) বললেন : ফিরিশতা পূর্ব ছুরতেই অন্ধের নিকট গিয়েও জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একজন মুসাফির (পথিক) সফর ভ্রমণে, এসে আমার পাথেয় সব শেষ হয়েছে– মহান আল্লাহ্ আপনাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়ে বহুত ছাগল দান করেছেন। গন্তব্যে পৌঁছার জন্য এ অভাবীকে আল্লাহ্র নামে একটি ছাগল দিন যেন, নিজ গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। অন্ধলোকটি বললেন যে, আপনার কথা-সত্য আমি অন্ধই ছিলাম। অভাবী ছিলাম। মহান আল্লাহ্- আমার চক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে বহুত ছাগলও দিয়ে অভাব দমন করেছেন। আপনি ছাগল পালে গিয়ে যা– ইচ্ছা আমার জন্য রেখে অবশিষ্ট্য ছাগলগুলো আপনার খরচের জন্য নিয়ে যান। তদুত্তরে ফিরিশতা বললেন : আল্লাহ্র শপথ-আমি একজন ফিরিশতা, ছাগল দিয়ে আমি কি করবো? আপনার ছাগল আপনার জন্যই থাকুক–

আপনাদের তিনজনকে আল্লাহ্ পাক আমাকে পরিক্ষার জন্যই পাঠিয়েছেন। এ পরীক্ষায় মহান আল্লাহ্ আপনার প্রতি খুশি হয়েছেন। আর আপনার সঙ্গি অপর দু'জনের প্রতি মহান আল্লাহ্ খুব বেজার।

(মুসলিম শরীফ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪০৮)

শিক্ষা : এ হাদিসে-সমগ্র পৃথিবীর রোগী ও মছিবত গ্রস্ত মানুষদের জন্য এ শিক্ষায় গভীর লক্ষ্যণীয়। সকল মানুষ আদি-প্রথম কিছুই ছিলেন না। জন্মের পর, জান-জীবন-মাল-দৌলত, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মছিবত হতে উদ্ধার-শারীরিক সুস্থতা সবই মহান আল্লাহ্র দান। প্রতিটি মানুষের সুখ-দুঃখের মালিক আল্লাহ্ পাক। সকল প্রকার বিপদ-মছিবত হতে মুক্তি পেয়ে ও আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের মালিক হলে- মহান আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা শুকরিয়া আদায় করা উচিত। এতে আল্লাহ্ তা'আলা খুশি হয়ে আরো অনেক কিছু দান করতে পারেন। উক্ত হাদিসে অন্ধলোকটিই ইহার প্রমাণ। আর আহম্মক বেওকুব লোক যারা– তারা আল্লাহ্র করুণাদান শুক্রিয়া ভুলে যেয়ে নিজের বাহাদুরী, চেষ্টায়, বংশ-গৌরব, অহংকারে আল্লাহ্র অভিশাপে নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন : এ হাদিসে উল্লেখিত প্রথম দু'ব্যক্তি, ধবল ও টাক্ওয়ালা। এসব লোকদের জীবন হলো : আল্লাহ্ পাকের নারাজি ও না-খুশির উপর। (তুহ্ফাতুল আম্বিয়ার)

এতদ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে– যাদেরকে আল্লাহ্ পাক বেশি বেশি, ভালবাসেন: তাদেরকেও বহু বিপদ, মছিবত দিয়ে ঈমান পরিক্ষা করেন। তাতে যারা অটলভাবে ধৈর্য্য ধরেন তাদেরকে বিপদ-মছিবত হতে মুক্তি দিয়ে, নে'মত দ্বারা পরিবর্তন করেছেন। এ বিষয়টি বহু নবী রাসূল ও আল্লাহ্র অলীদের জীবনিতে পরীক্ষিত।

আরো উল্লেখিত যে– যারা আল্লাহ্‌র দুশমন, তাদেরকে দুনিয়াতে ধন-সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে পরকালে বিপদে ফেলে রাখেন।

রোগ হতে মুক্তি পাবার কয়েকটি হাদিস

উম্মূল মু'মেনিন হযরতে আ'য়েশা (রা.) হতে বর্ণিত : তিনি বলেছেন আমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে তার উপর রাসূল আক্‌রাম (সা.) ডান হাতে মুছে দিতেন : অতঃপর নিম্ন দোয়া পাঠ করতেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ ـ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-২২২

উচ্চারণ : আযহিবিল্ বা'সা রাব্বান্ নাস্-ওয়াশ্‌ফি আন্‌তাশ্ শাফী-লা শিফায়া, ইল্লা শিফাউকা-শিফাআন্ লা ইউগাদিরু সাকামান।

হযরত আয়েশা (রা.) হতে আরো বর্ণিত : তিনি বলেছেন : যখন ঘরে কেউ রোগাক্রান্ত হতেন, তার উপর রাসূল করিম (সা.) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ক্কুল্ আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ক্কুল আ'উযু বিরাব্বিন নাসি অর্থাৎ- সূরা ফালাক্ ও সূরা নাস্ পাঠ করে ফুঁক দিতেন।

মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-২২৩

* হযরত উসমান বিন্ আবুল আ'ছ সাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত : রাসূল করিম (সা.) বলেছেন : কারো শরীরে কোন জায়গায় ব্যথা হলে, সেখানে হাত রেখে পাঠ করো বিস্‌মিল্লাহ্ তিন্‌বার অতঃপর- সাতবার এই দোয়া পাঠ করো :

اَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ.

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লাহি ওয়া ক্কুদরাতিহি মিন্ শার্‌রি মা আজিদু ওয়া উহাযিরু। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা ২২৪

* হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত : সাপ বা বিচ্ছু কাম্‌ড়ালে-দংশিলে, সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিলে রোগী ভাল হয়ে বিষমুক্ত হয়। অথবা তৎসঙ্গে থুক দিলে বিষ নেমে ভাল হয়। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-২২৪

* হযরত ইব্‌নে উমর (রা.) হতে বর্ণিত : হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : জ্বর জাহান্নামের তাপ হতে, সুতরাং মাথায় পানি দিয়ে তাপ ঠাণ্ডা করো। জ্বর ভাল হবে। (মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা-২২৬)

বাংলায় ১৪টি বিশেষ মুনাজাত

১. মুনাজাত

আল্লাহ্ তুমি ক্ষমাকারী, ভালবাস তুমি ক্ষমাকে
মোদের সকল গুণা ক্ষমা করে মুক্তি দাও।
সবদিকের শান্তি দিয়ে তোমার প্রতি ভক্তিদাও
রাহিম, তোমার স্মরণে।
প্রভূ তোমার করুণা চাই-এই কাঙ্গালিদের সর্ব জীবনের।
কত গুণাহ্ করছি মোরা হিসাব নাইকো আমাদের
প্রভূ তুমি দয়ার সাগর দয়া কর এই এই পাপীদের
পেরেশানী হটায়ে-দুর্ভাবনাও দমনে,
প্রভূ তুমি তৃপ্তিকর অন্তরে-তোমার দেখা দাও আমাদের।
ইহাই মোরা আশাবাদী-পুরা জীবনে, পরে মরণে।
প্রভূ তোমার করুণা চাই- এই কাঙ্গালিদের সর্ব জীবনের।
প্রভূ তুমি ক্ষমা কর আমাদের সকল
ঈমান্দার মানুষের কবরে
প্রভূ তুমি রিজিকদাও সকলের-প্রাণীসহ্ আমাদের
সবার আসাই পূর্ণ কর- সহজ কর কামেতে।
প্রভূ তোমার করুণা চাই- এই কাঙ্গালিদের সর্ব জীবনের
আল্লাহুম্মা আমিন।

২. মুনাজাত

* অণুগ্রহে মা'ফ করে, কবুল কর- এই অধমদের ইবাদত-
তোমার দরবারে-
মোদের নাই কোন সমর্থশক্তি তুমি ছাড়া ওগো মা'বুদ- আমাদের।
* কত যে মানুষ লোকান্তরে আছে তোমার অসীম কালের পথেতে।
তারা কি অবস্থায় আছে মা'বুদ- "তা" জানা নাইকো আমাদের।
* দাও ক্ষমা কইরে- দাও মুক্তির উপায় তারা সহ, আমরা জীবিতদের।
সুখ সাগরে ভর্তি কর- ভাষায়ো না-ওগো
প্রভূ, মোদের দুঃখের সাগরে।
অন্তরের কান চক্ষুসহ খুলে দিয়ে- সুখ সুন্দরময়, আল্লাহ্
তোমার দেখা দিয়ে মোদের মন ভরে দিয়ো

যাবতীয় গুণাহ্ মা'ফ করে– তোমার প্রতি ঈমান মোদের ঠিক রাখিয়ো।
ওগো প্রভূ, তোমার প্রিয় বন্ধু!
ঈমামুল মুরসালিন রাসূল– নবী আমাদের গুণে
সকল মুশ্‌কিল মুছে দিয়ো- দুঃখ্ দিয়ো না– প্রভূ তুমি
মোদের কারো মনে।
আল্লাহুম্মা আমিন।

৩. মুনাজাত

* ওগো আল্লাহ্- করুণাময়– এই বিশাল বিশ্বের মাঝে
তুমি গুপ্ত ধণ-ভাণ্ডার-বিশাল শক্তিধর
মানুষের নিকট তুমি-নিজের প্রকাশকে ভালবেসেই,
সৃজন করেছো এই বিশাল জগৎ।
* চাঁদ-সুরুজ, গ্রহতারা, আমরা সহ, তোমার যত
সৃষ্টি আছে– তা বানাইছো মানুষদের কল্যাণেই
তার বিনিময়ে তুমি কিছুই চাও নাই "প্রভূ"
তুমি আমাদের নিকটে।
* এত বড় দয়াল দাতা তুমি-জানিয়া বুঝিয়াও,
আমরা করি যে ভুল–
সেই ভুলে ভরা-মোদের জীবন গড়া, এ লজ্জা
ঢাকিবার নাই কো মোদের কুল।
* ওগো রহমান, কবরও দোজখের আজাবতো আমরা
পারিবোনা সহিতে
মা'ফ কইরে দাওগো আল্লাহ্– তোমার রাহিম ও কারিম
নামের গুণেতে।
* কোন উপায় নাই-কো, মা'বুদ-তুমি ছাড়া আমরা অধমদের
তুমি দয়ার দরিয়ার মালিক– মা'ফ কর, বরকতসহ্
দান কর, আমাদের উপরে।
আল্লাহুম্মা আমিন।

৪. মুনাজাত

ওগো আল্লাহ!
* বেহেস্তে তোমার করুণাদান– উহা- সব হুর গেল্‌মানের বাসস্থান-
মোদের কাল্‌বে নাও-তোমার নিজের স্থান- মোদের
সেই মো'মেন বানাও গো মেহেরবান।

* বেহেস্তের সুখ শান্তির চেয়ে-অধিক সুখ-শান্তির মালিক
তুমি নিজেই- আমরা তোমায় দেখ্‌বার শান্তিই চাই
তোমাকে দেখারমত অত সুখ-শান্তি তো-ঐ হুর গেলমানের বেহেস্তের মধ্যেও নেই।
* তাই এনাবরেত পথেই হোক, আর এজাবতের পথে
জীবন ব্যাপী তোমার নূরের দেখা দিয়ো
পরে তোমার নিজের দেখা দিয়ে প্রভু
মোদের তৃপ্তি মিটায়ো।
* ওগো গাফ্‌ফার- আমরা গুনাহ্‌গার-পর্বতসম গুণা
করে তোমার জগৎ করছি ভার
তবুও তুমি, ক্ষমাশীল অসীম করুণাময়
সৎ পথের মন বানাও মোদের কইরে নাও উদ্ধার।
আল্লাহুম্মা আমিন।

৫. মুনাজাত

* ওগো দয়াবান আল্লাহ্‌!
অণুগ্রহে কবুল কর- মোদের এই ইবাদত তোমার দরবারে,
আমরা সাচ্চা দেলে হাত উঠাইছি- তোমার মহব্বৎ পাবার নিয়তে।
* ভুলভ্রম, পাপ-গুনা যতই আছে মোর-
মেহের ও বক্‌শিশ তোমার বেশুমার সেই রূপ।
* বহুতরও গুণা প্রভু করেছি এ জীবনে-
বালুকা রাশির মত হিসাব নাইকো আমাদের
* ক্ষমা কর ওহে প্রভূ- পুরা করো আশা-
দুঃখান্তরে আছি মোরা- বক্‌শ সেরা শাফা।
* খলিলেরও তরে যেইছা বলেছ্‌ আগুনে-
বলিয়ো মোদেরও তরে, সেইরূপ ইচ্ছাধীনে।
* কবুল করো ওহে প্রভূ! মোদের উল্লেখিত ফরিয়াদ
ফিরে দিয়ো না, মাওলা তুমি এই পাপীষ্ঠদের খালি হাত।
* দয়ারো ভাণ্ডার-তোমারো আছে- মাওলা কমতি
নাইকো পাকজাত-
তাই মন খুলিয়ে চায়ে রইলাম- মাওলা ফিরে দিয়ো না মোদের হাত।
আল্লাহুম্মা আমিন।

৬. মুনাজাত

* ওগো আল্লাহ্! তুমি জলিল জাব্বার-তুমি গাফ্ফুরো গাফ্ফার
কবুলের যোগ্য নামাজিদের সাথে মোদের দলভূক্ত কর।
ক্ষমাকর মুক্তি দাও, মা'বুদো সাত্তার।
* ভাইবোন, ভগ্নিপতি, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশি ইমান্দার,
পিতামাতা ছেলে-মেয়েসহ প্রভু আমাদের আদরে রাখিয়ো।
পরকালে পাপ পুণ্যের হিসাবের সময়ে-
মোদের প্রতি বিপদ মুক্তির সমাধান করিয়ো।
* ওগো আল্লাহ্! তুমি প্রত্যেক বিষয়ের উপরেই সর্বশক্তিমান-তুমি মহান শক্তিধর।
দু'জাহানের জীবনে মোদের-ধন্যবান কইরো- অন্তরেতে ভরে দাও, তোমার নুরেরও ঝলক।
* ওগো দয়াবান! সাগর ভরা মাছ কত স্থলচর, জলচরেরা,
আকাশের পাখিসব কত গ্রহতারা, সব তোমার জানা
মোদের সেই পরিমাণ পাপও যদি থাকে- প্রভূ ক্ষমা করে
সকলের পুরা করো সকল বাসনা।
* পাহাড় ভরা ধন দিয়ো- বৃক্ষভরা ফল- আর মাঠ ভরা : ফসল দিয়ো যেন-কমেনা কো ধন
বিপদের কাণ্ডারী তুমি, বিপদ মুক্তি করো ক্ষমা করো খুশি করো
মোদের সকল মন।
আল্লাহুম্মা আমিন।

৭. মুনাজাত

* ওগো মহা বিশ্বের মালিক মোদের আল্লাহ্!
তোমারি মদদেতে নামাজ মোদের জীবনের সাথী,
কবরেরও বাতি, মো'মেনের মে'রাজ ও বেস্তের চাবি।
* ওগো আল্লাহ্! অন্ধকার কবরে এই নামাজ মোদের-
আলোকদান করিয়ো,
মুনকির-নাকিরের সওয়াল-জবাব মোদের, সঠিক করিয়ো।
* কবর ও দোজখের আজাব হতে- মোদের মুক্তিদান করিয়ো-বিজলীর আকারে, কঠিন পুলছেরাত পার-মোদের সহজ করিয়ো।
* ওগো গাফ্ফার- তোমার সাত্তার নামের গুণে-
জীবনের সকল অপরাধ মোদের-গোপনে রাখিয়ো-

গুণা ভরা জীবন মোদের– মা'ফ করিয়ো।
* ওগো রহমান! ছয় লতিফার অন্তঃস্থলে, তোমার নূরের জলক দিয়ো–
তোমারি মহব্বতে-বিশ্বব্যাপী বক্ষ মোদের উদারে রাখিয়ো।
* ওগো আল্লাহ্! তোমারি কুদরতে, যুগে-যুগে, কত মানুষ আসে এ দুনিয়ায়–
পর পারেও চলে যায়–
তারা কে কোথায়? সুখে আছে না দুখে কে পারে
তা- জানিতে, তুমি মহিয়ান, তুমি গরিয়ান তোমারি
রহমতে এত মহা সুখে– যেন স্থান পাই মোরা এ জীবনে।
আল্লাহুম্মা আমিন!

৮. মুনাজাত

* ওগো রহমান! দুনিয়া ও পরকালের অনন্ত জীবন যাতে আমাদের শান্তিময় হয়–
দুনিয়ার জীবনে চলন্ত পথে, আমাদের সবগুলো কাজে যে-পথ ধরায়ো।
* ওগো মেহেরবান! আমাদের নামাজে কবরের ঘরকে
বেহেস্তের সুখেতে– আতরের সুবাসে, সুবাসিত করিয়ো
কিয়ামতের মাঠে– তোমার মহা আরশের ছায়াতলে
আমাদের জায়গা করে দিয়ো।
* ওগো দয়াবান! বিপদের জালে–ফেল না সে– কালে
তোমার রহমতের দরজা সেদিন আমাদের তরে খুলিয়া রাখিয়ো–
সে বিপদের কালে প্রিয় রাসূলের (সা.) সুপারিশ সেদিন
আমাদের ভাগ্যদান করিয়ো।
* ওগো আল্লাহ্! বেহেস্তের সবগুলো অবদান, তোমার
মহামূল্যবান, তা আমাদের নছিবে রাখিয়ো
তোমার পরম সুখের স্থান– জান্নাতুল ফেরদাউসে মোদের
বাসস্থান করিয়ো!
আল্লাহুম্মা আমিন।

৯. মুনাজাত

* আল্লাহ্ তুমি মহা পবিত্র!
বিশ্বজোড়া, ভাবি মোরা, অসীম তোমার কল্পনা
মহা জ্ঞানের মালিক তুমি– মহা মহিমা।
* যে ভাবেতে ডাক্‌লে মা'বুদ খুশি হও,
সেভাবের মন, বানাও মোদের– ওহে রাব্বানা,

তোমাকে মানবার জন্যই জন্ম মোদের
এসেই দুনিয়া– ভক্তি দাওগো তোমার প্রতি
বঞ্চিত কইরো না।
* ওগো আল্লাহ্! তোমার কাছেই ফিরবো মোরা
আমরা কোনই শক্তির মালিক না–
সুখ-দুঃখের মালিক তুমি
দু'জাহানের সুখের জীবন দাও
মোদের প্রতি আল্লাহ্ তুমি বেজার হইয়ো না।
আল্লাহুম্মা আমিন!

১০. মুনাজাত

* ওগো মেহেরবান আল্লাহ্!
আমরা মানি তুমিই রাজ্জাক-তুমিই ওয়াহ্হাব
এ অধমদের দুনুকালে জীবন ব্যাপী শান্তি দাও
এতে মাওলা তোমার কোনই লোকছান হবে না।
আমরা খাক্ছার– অসীম গুনাহ্গার,
ক্ষমা চাই– মুক্তি চাই-ইহাই মোদের আসল বাসনা।
* এই যে তোমার সসীম দুনিয়া-তোমার কাছে চাওয়া-পাওয়াই মোদের কামনা– আরত কিছু না–
দাও প্রভূ দাও– হাত ভরিয়ে– ক্ষমা দিয়ে, রিজিক দাও–
এতে তোমার এ পাপীদের হাত ফিরেয়ো না।
* প্রভূ তুমি– ভাণ্ডার ভরা ধনের মালিক– সর্বশক্তিমান–
তাই তোমার কাছেই বারে– বারে, ফিরে-ফিরে, চাই,
এমন দান, কইরো, মোদের তরে যেন– ঈমান্দার
কবরবাসী সহ, আমরা শান্তি পাই, যেন জীবন্ত
ঈমান্দার পরিবার সহ, আমরা শান্তি পাই।
আল্লাহুম্মা আমিন!

১১. মুনাজাত

* ওগো রহ্মান! শিক্ষায়, সংসার, ব্যবসায়, চাকুরীতে, তোমার রহমত– বরকতে, উন্নয়ন করিয়ো–
জীবিকা দানেতে তোমার নে'মতের দরজা সকলের

তরে খুলিয়া রাখিয়ো।

* ওগো আল্লাহ্! মুক্ত মন নিয়ে– আমরা সকলেই ভয় করি
ভালবাসি তোমাকে– এমনি মন মানুষ আমাদের বানাইয়ো
তুমিয়ো মোদের প্রতি–চলন্ত জীবনে রাজি-খুশি থাকিয়ে–
অনুগ্রহ করিয়ো।

* দয়াময় আল্লাহ্! দুনিয়াবী জীবনে– মরণে, পরকালেও
সুখ হয়, এমনি কামই আমাদের করাইয়ো–
কিয়ামতের মাঠেতে– আরশের ছায়া দিয়ে মুক্তির সমাধান করিয়ো।

* গাফুর-গাফ্ফার! আমাদের ইবাদতে ভুলত্রুটিগুলো
ক্ষমা করে দিয়ে শাহী দরবারেতে কবুল করে নিয়ো–
পাপ থেকে মুক্ত করে তোমার জান্নাতুল ফেরদাউসে মোদের
ভাগ্যদান করিয়ো।

আল্লাহুম্মা আমিন!

১২. মুনাজাত

ওহে মোদের আল্লাহ্! প্রথম যেদল বেহেস্তে যাবেন– তারা সাত
লাখ কি, সত্তুরো হাজার তোমার প্রিয় বান্দারা
তোমারি কুদরতে– ১৪ই তারিখের চন্দ্রের কিরণ উজ্জল তারার মত
তাদের চেহারা পাবেন, সবাই তারা।

* তোমার প্রিয় বান্দার দলেই অন্তর্ভুক্ত হয়েই আমরা বেহেস্তে
যাবার চাই, তোমার কাছে তাই, আগেই ক্ষমা চাই
তোমারি করুণাদানে- মোদের ভাগ্যময় করো প্রভূ তাদের দলেই
বেহেস্তে যেন– আমরা সবাই পাই।

* ওগো জাব্বার! আমরা খাক্ছার-কতগুলো যুবক-বুড়া,
কচি বান্দাসহ হাত উঠাইছি তোমার নিকটে
ঐ মা'ছুম বান্দার ওছিলায়-কবুল কর মোদের ইবাদত-বুক
ভরা মিনতি এই–তোমার দরবারে।

* ওগো মাওলা! তুমিত মোদের সৃষ্টিকর্তা-তুমিই মোদের পালক
তুমি ছাড়া কোনই মা'বুদ নাই– হই-পরকালে
তোমার কাছেই জীবন ছেড়ে দিছি মোরা– খুশি থাকো, রাজি থাকো,
প্রভু তুমি, আমাদেরকে নিয়ে।

* ওগো দয়াবান! ফিত্নাতুজ্ দজ্জাল–ফিত্নাতুল কাজ্জাব

হতে– আমরা মুক্তি চাই, সকল মু'মিনের, সকল মুসলিমের–
তোমার নূরের দেখা চাই, মোদের ক্বালবে– তোমার আসন যেখানে।
আল্লাহুম্মা আমিন।

১৩. মুনাজাত

* ওহে মোদের আল্লাহ্! তোমারি সৃষ্টির কুদ্‌রতের সীমাহীন
কারখানা দেখে– আমরা কত যে অবাক হয়ে যাই–
তোমাকে ভয় করেও আমরা– পাপে জীবন কাটি– আবার
ঘুরে ঘুরেই বুঝি– তোমার দয়া ছাড়া আমাদের
কোন উপায় নাই।

* ওগো আল্লাহ্! তুমি খুশিতে বানাইছো মোদের
এ জীবন– আবার বেজার হয়ে শাস্তি যদি দাও–
এতে তোমার তো, কোনই লাভ লোকছান নাই–
পবিত্র কুরআনে– কত যে ভয়-খুশি, দেখাইছো–
দোজখ–বেহেস্তের
–কাফেরেরা দোজখে শাস্তি পাবে
আমরা তোমার ক্ষমাও বেহেস্তই চাই।

* ওগো দয়াময় প্রভূ! মুর্‌তাদ নাস্তিকেরা, সবদেশেই
অপকর্মের মূল– হয় তাদের পথ দেখাও–হয়ে যাক্
খাঁটি মুসলমান–
হিন্দু–খৃষ্টান-ইয়াহুদ বৌদ্ধসহ, হোক সবাই মুসলমান–
না হয়, ওগের সহ মুসলিম–জালিমদের বল
ধ্বংস কর দুর্গসহ করে খান-খান।

* ওগো আল্লাহ্! সারা জগতের মানুষ-এক আদম বংশ ধর
যদি চাও, চালু কর, সবার মাঝেই ইসলামের বাতি
অস্ত্রবল ধ্বংশ্বকর-দেশ বিদেশে কল্‌হ-বিবাদ বন্ধকর
শান্তিকর বিশ্বে সব মুসলিমে একজাতি।

* ওগো মহান আল্লাহ্! তোমার ভালই ভাল চাই– যদি না চাও ওরা
কতেক–তোমার পথে আসুক–শক্তি ওদের ধবংশ কর আসমানি
গজবে–যেমন তোমার ধ্বংশ লিলা চলছিল–
হযরত নূহ ও মুসা (আ.) এর শত্রুদলের উপরে।
আল্লাহুম্মা আমিন।

১৪. মুনাজাত

* ওহে জগতের মালিক- রহ্মান!
দুনিয়াদারী জ্ঞানের সাথে– তোমার ইসলামী দ্বীনদারী
জ্ঞানের নূরে-মানব সমাজ গঠনকর বিদেশসহ এদেশ বাসীদেরে–
আত্ম শুদ্ধিসহ আত্ম সংযমের সাথে সত্যিকারের মানুষ
বানাও– তোমায় যেন চিনি মানি-সাজাও মোদের এ জীবন, এমন-সুন্দর করে

* ওগো প্রভূ দয়াবান!
তোমার ইসলামের বিধানে– নৈতিকতার শুদ্ধ জ্ঞান হারিয়ে
মিথ্যাচারে ডুবছে মানুষ–দেশ-দেশান্তরে
কত বিশৃংখলা-দুর্নীতিবাজ, মুনাফেক্ ধোকাবাজ, হিংসুক
–লুটতরাজ, অত্যাচার-খুন্ খারাব, মুনাফাখোর- ঘুষখোর।
আরো অহংকারে, এসব পাপাচারে তারা জগনগণের অর্থও রক্ত চুষণ করে।

* ওগো আল্লাহ্! উপর্যুক্ত অপকর্মসহ ওয়াদা ভঙ্গ করে যারা
জ্ঞান পাপী মানুষ তারা তাদের এসব নির্যাতনে
অর্থ নীতির সুষম নীতির-মেরুদণ্ড ভেঙ্গে মানুষ–দারিদ্রের
সীমা রেখা ছেড়ে দেশ– অতল তলে তলিয়েছে গহিন সাগরে।

* ওগো মেহেরবান! ঐ জ্ঞান পাপীদের এমন দলনে– অত্যাচারের
মাত্রা গেছে ছেড়ে– এদের থেকে সবদেশেই সবাই মুক্তি চাই
কবুল কর মোদের এ নামাজ– বন্ধ কর ওদের কুকাজ–
না– হয়, অন্যায় কাজের শক্তি ওদের ধ্বংস কর আসমানী
গজবে– যেমন তোমার ধবংস লিলা চলছিল– কাফির ও
জালিম লোকের উপরে।
আল্লাহুম্মা আমিন!

সমাপ্ত

ইসলামি জীবন ব্যবস্থা
ও
মা'রেফাতের নিগূঢ় রহস্য
কাজী মুহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম সুখনগরী